কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রকাশক

শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সেক্রেটারি,
মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি। ৩, গৌরমোহন
মুখার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

মুদ্রাকর : শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ, ডায়মণ্ড
প্রিণ্টিং হাউস, ৭৯এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
(আষাঢ় ১৩৬০)

মূল্য : দুই টাকা।

উৎসর্গ

যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী শিষ্য, যিনি শ্রীমৎ স্বামী
বিবেকানন্দ মহারাজজীর গুরুভ্রাতা, যিনি শ্রীমৎ স্বামী
বিবেকানন্দ মহারাজজীর জীবন ও সাধনের সঙ্গী,
যাঁহাকে স্বামিজী "মহাপুরুষ" বলিয়া সম্বোধন
করিতেন, যিনি "রামকৃষ্ণ মিশন" স্থাপনে
স্বামিজীর সহযোগী, যিনি বর্তমানে "রাম-
কৃষ্ণ মিশনের" দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট,
সেই যোগসিদ্ধ, মহাত্যাগী ধর্মাচার্য,
মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী
মহারাজের করকমলে এই
পুস্তকখানি ভক্তিভাবে
উৎসর্গীকৃত
হইল।

নিবেদন

পূজনীয় স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ) কথিত "৺কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ" শ্রদ্ধেয় শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বিগত ১৩৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর মধ্যেই উক্ত সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। অতঃপর স্বামী সদাশিবানন্দ মহারাজের অনুরাগী ভক্ত শ্রীহলধর সেন মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল। আমাদের পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত মানস প্রসূন চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তক প্রকাশনায় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া সমস্ত কার্যাদি করায় তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি। ইতি—

১লা আষাঢ়, ১৩৬০
৩নং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রকাশক

পরিচয়

"৺কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। বাঙলার বাহিরে বাঙালীর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ কীর্তি আছে তাহার মধ্যে ৺কাশীধামে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, শুধু গৌরব বৃদ্ধি নয়, বর্তমান ভারতের সেবা-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠ শিক্ষাস্থল। সেই সেবাশ্রমের মূল সূত্রটি জানিবার কাহার না ইচ্ছা হয়? আর সেই মূল সূত্রের সৃষ্টিকারীর জীবনের চিন্তারাশি জানিবার কাহার না প্রবৃত্তি হয়? লেখক সেই সূত্রটির গোড়াপত্তনের ইতিহাসটুকু সাধারণের নিকট অল্প ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানে ভক্তরাজ উপস্থিত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বর্ণনাগুলিও বেশ মাধুর্য্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই পুস্তক প্রণয়নকালে যাঁহাদিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

প্রথম সংস্করণ
কলিকাতা, ২২শে ভাদ্র, ১৩৩২

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাগ্‌বাণী

১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে প্রয়াগে অবস্থানকালে ভক্তরাজের (হরিনাথ ওদেদার বা স্বামী সদাশিবানন্দ) সহিত আমার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীর সম্বন্ধে নানাবিধ প্রসঙ্গ হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে ভক্তরাজ বলিলেন, "স্বামিজী যখন শেষবার কাশীধামে আসিয়াছিলেন তখন আমি স্বামিজীর নিকটে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া আমি ১৬নং হিউএট রোডস্থ "ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে" বসিয়া স্বামিজীর সম্বন্ধে ভক্তরাজকে নানাবিধ প্রশ্ন কারতে লাগিলাম। আমার প্রশ্ন শুনিয়া ভক্তরাজের পূর্বস্মৃতি অনেক পরিমাণে জাগরিত হইতে লাগিল। ভক্তরাজের মুখ হইতে স্বামিজীর উপাখ্যানগুলি শুনিয়া উপস্থিত সকলে বড় মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু পাছে সেইগুলি ভবিষ্যতে নষ্ট হইয়া যায় সেইজন্য উপাখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। ভক্তরাজ তাঁহার সহজ সরল ভাষায় কিছু বলিতেন আর বাকীটুকু হস্তাদি সঞ্চালন, মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও ভাব-বিহ্বল নেত্রদ্বয় দিয়া প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অস্পষ্ট ভাব স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

উপাখ্যানগুলি বলিতে বলিতে তিনি সহসা এরূপ উচ্চ ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেন যে আর বলিতে পারিতেন না, ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, "আমি যেন স্বামিজীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই সমস্ত ঘর-দোর যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে দেখছি, তাই আর কিছু ব'লতে পাচ্ছি না।"

এই সমস্ত উপাখ্যানগুলি, ভক্তরাজের ভাবব্যঞ্জক মুখভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর

শুনিয়া ঘটনাগুলির পারম্পর্য ঠিক রাখিয়া সেইগুলি আমি ভাষায় বলিয়া যাইতাম আর শ্রীউমেশচন্দ্র সেন লিখিয়া যাইতেন। ভক্তরাজ ও অপর সকলে বসিয়া নিকটে শুনিতেন এবং তাঁহাদের ভাব যে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে, ইহা তাঁহারা অনুমোদন করিতেন। এই সময়ে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজজী প্রয়াগেতে গিয়াছিলেন এবং তিনিও বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে এই উপাখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেইজন্য মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজজীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিতেছি। ইতি—

প্রথম সংস্করণ
কলিকাতা, ২২শে ভাদ্র, ১৩৩২

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

His name, His associations, His place, the persons He talked with, the things He touched, are all sacred to me, as they belong to my Beloved. I live, move and have my being, and I talk and smile, because my Lord is pleased with it. I cannot be miserable, because He never likes it. Even if any misery comes, I must rejoice, as it is a special gift from my Beloved. It is not the 'I' of the body that suffers, but the 'I' of the most Beloved. I cannot hate others, because He never hates them. It is for His sake my mind spontaneously flows towards others; every creature on earth belongs to Him, I am His, so are they mine. He is my Lord, my Master, the very pupil of my eye, the smile on my lips, the very blood that courses through my veins, the heart of my heart, the very pith and marrow of my bones, I am His, entirely, absolutely.
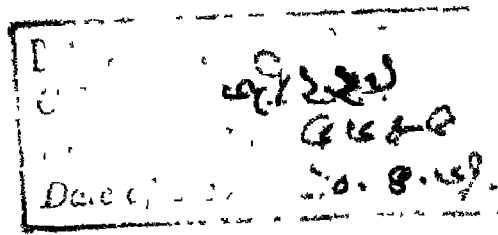
কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের পুণ্যকীর্তির বিষয় প্রথম আমি আরা সহরে এক পাঠাগারে জনৈক প্রধান উকিলের মুখে শুনি,—একজন বাঙ্গালী যুবক সন্ন্যাসী আমেরিকার সিকাগো (Chicago) নগরে ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং তথায় বহুশত পৃথিবীস্থ ধর্মযাজক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত প্রধান ধর্মসমূহ এই সনাতন ধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা শ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম এবং আমার মনে হইল যে, আমার যেন কেহ পরম আত্মীয় এরূপ যশোলাভ করিয়াছেন।

সাধু-মহাপুরুষদিগের মুখে শুনিতে পাই যে, পূর্বজন্মান্তরীণ সম্পর্ক মনুষ্যের মধ্যে সুষুপ্ত অবস্থায় প্রোথিত থাকে, এবং কোনকালে উক্ত প্রসঙ্গ উঠিলে সেই সুষুপ্তভাব জাগ্রত হইবার চেষ্টা করে এবং অস্পষ্ট-বিস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়া অর্ধোচ্ছ্বাস-ভাবে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয় শাস্ত্রকারগণ, এমন কি মহাকবি কালিদাসও শকুন্তলাতে হংসপদিকার গীত শ্রবণে

স্বপ্নান্তের ভাবান্তর প্রভৃতি অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কি কারণে ইহা উদ্ভূত হয় তাহার বিচার এস্থলে নহে। কেবলমাত্র ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, "প্রিয়মত্যন্ত-বিলুপ্তদর্শনম্" * সহসা দর্শনপথে উপস্থিত হইলে যেরূপ যুগপৎ আনন্দ ও হর্ষ হৃদয়ে উপস্থিত হয়, আমারও স্বামিজীর বিষয় শ্রবণে তদ্রূপ হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে আমি আরা হইতে ইংরাজী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাদ্রমাসে আমার এক সহোদর বিয়োগের পর মাতা এবং সন্তপ্ত অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত কাশীধামে আগমন করি। সে সময় আমি একজন বৈষ্ণব মহাপুরুষের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে বৈষ্ণবধর্মের সাধনা করিতে আরম্ভ করি। দৈবক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই ৺সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উক্তি" পড়িয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম।†

কিছুদিন পরে সেই বৎসর শারদীয়া ৺মহাষ্টমীর দিনে আমার এক বন্ধু শ্রীযুক্ত জগৎদুর্লভ ঘোষ মহাশয়ের সহিত

* কুমারসম্ভব, ৪র্থ সর্গ।

† সুরেশবাবুর সংকলিত বইখানি (দুই খণ্ডে) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত হয়; নাম ছিল, "পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি"। পরে তিনি পরিবর্ধিতাকারে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উহার পুনর্মুদ্রণ করেন। এ সম্বন্ধে দি হরমোহন পাবলিশিং এজেন্সীর প্রকাশিত ৺সুরেশ চন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ" গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য। সঃ

দুর্গাবাড়ীতে ৺মায়ের দর্শন লাভার্থ গমন করি এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ স্বামী ভাস্করানন্দজী মহারাজের দর্শনার্থ আমিঠি রাজার বাগানে গমন করি। তথা হইতে দর্শনাদি করিয়া ফিরিব এমন সময় আমরা দেখিতে পাইলাম যে, দুইজন সন্ন্যাসী এবং দুইজন অন্য ভদ্রলোক একত্রে তথায় প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক-জনের হৃষ্টপুষ্ট এবং চিত্তাকর্ষক মূর্তি দর্শনে পরম আনন্দলাভ করিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যেন, ইনিই স্বামী বিবেকানন্দ হইতে পারেন। প্রথমোক্ত সাধুটি স্বামী ভাস্করানন্দজীকে 'নমো নারায়ণ' করায় ভাস্করানন্দজীও তাঁহাকে 'নমো নারায়ণ' করিলেন এবং উভয়ে নানারূপ বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। কথা ও ভাবভঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম যে, স্বামী ভাস্করানন্দজীর সহিত ইঁহাদের পূর্বেই পরিচয় ছিল এবং বেশ ঘনিষ্ঠতাও আছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উত্থাপিত হইলে স্বামী ভাস্করানন্দজী অতি নম্র, কাতর ও ব্যগ্রভাবে মধুরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ভাইয়া, স্বামিজীকো এক মর্তবা দর্শন করাও।" গৃহমধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও ভাস্করানন্দজী পুনঃপুনঃ স্বামিজীর কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন, যেন তখনই দর্শন পাইলে শান্তি হয় নহিলে আর কিছুতেই তাঁহার মনে শান্তি আসিতেছে না। স্বামিজীর দর্শনলাভের জন্য এরূপ যোগীরও যে, চিত্ত এরূপ বিক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত হইতে পারে তাহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য

হইলাম। কারণ সচরাচর ভাস্করানন্দজীর চিত্তচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইত না। সম্মুখস্থিত বাঙ্গালী সন্ন্যাসীটি বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, হম্ অবশ্য উনকো লিখেঁগে; উয়ো অভি দেওঘরমে বায়ুপরিবর্তনকে লিয়ে গিয়া হ্যায়।"* স্বামী ভাস্করানন্দজী উক্ত সন্ন্যাসীদিগকে পুনরায় রাত্রিকালে আসিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিবার পর আমি তাঁহাদিগের সঙ্গী একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, ইনি হইতেছেন স্বামী বিবেকানন্দজীর গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

এইরূপে কিছুকাল যাইবার পর একদিন সন্ধ্যা করিয়া উঠিয়াছি এমন সময় চারুবাবু আমার বাটীতে গিয়া আমাকে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর 'উদ্বোধনের' গ্রাহক সংগ্রহার্থ আদেশ জানাইলেন। কিন্তু আমি সেই দিনই নির্জনবাসেব জন্য উদ্যোগী হইতেছিলাম বলিয়া দুঃখের সহিত অক্ষমতা প্রকাশ করিলাম। আমি নির্জনবাসের জন্য অসি-ঘাটের এক বৈষ্ণব মঠে ব্যবস্থা করিতে যাইব শুনিয়া তিনিও আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই অবধি তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইল এবং তাঁহার নিকট হইতে স্বামিজীর বিষয় শ্রবণ করিয়া এবং স্বামিজীর 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার কাছে পাঠ করিয়া দিন দিন স্বামিজীর

---

* মতান্তরে, স্বামিজী দেওঘরে গিয়াছিলেন ডিসেম্বর মাসে (খৃঃ ১৮৯৮)। প্রমথনাথ বসু লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দ" দ্রষ্টব্য। সঃ

উপর আমার ভক্তি দৃঢ় হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের সাধন-জীবনের বিষয় নানারূপ আলোচনা দুই বৎসরকাল শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেদারনাথ মৌলিক (স্বামী অচলানন্দ) ও চারুবাবুর (স্বামী শুভানন্দ) বাড়ীতে পরিচালিত হইবার পর স্বামিজীর 'কর্ম্মযোগ' চারুবাবু বিশেষ-ভাবে আমাদের বাড়ীতে পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করান। ইহার অল্পদিনের মধ্যে তিনি—শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার, কেদারনাথ মৌলিক, বিভূতিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, হরিদাস ওদেদার, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ ও পণ্ডিত শিবানন্দ ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে লইয়া সেবাশ্রমের কার্য আরম্ভ করেন; এবং ক্রমশঃ রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর এম, এ, মহাশয়ও, স্বামিজীর উপদেশানুসারে এই কার্যে যুবকমণ্ডলী ব্রতী হইয়াছেন, শুনিয়া পরম উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া স্থানীয় ভদ্রমহাশয়দিগকে লইয়া একটি সভা গঠন করিলেন। এইরূপে কিছুকাল কার্য চলিবার পর মিত্র মহাশয়ের ৺কাশীলাভ হইল। পরে স্বামিজীমহারাজের আদেশ অনুসারে উক্ত আশ্রম কাশীস্থ ভদ্রমহোদয়গণের সম্মতিক্রমে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইল।

কিছুদিন পরে আমাদের বালকসঙ্ঘের ভিতর খবর আসিল যে, স্বামিজী বায়ুপরিবর্তনের জন্য কাশীধামে আগমন করিতেছেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাটীতে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সঙ্ঘের প্রতিনিধিস্বরূপ আমি

পুষ্পমালা ও পুষ্পগুচ্ছ লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত গেলাম। স্টেশনে আমি ও চারুবাবু প্রভৃতি তাঁহার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। স্বামিজী গাড়ী হইতে নামিলে আমি তাঁহার গলদেশে অভ্যর্থনাসূচক মাল্য বিন্যস্ত করিয়া দিলাম এবং চরণে পুষ্পাদি উপহারস্বরূপ প্রদান করিলাম। পরমুহূর্তে আমি স্বামিজীর মুখের দিকে চাহিবামাত্র আমার পূর্বস্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠিল; স্বপ্নাবস্থায় ইতিপূর্বে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই ব্যক্তি! সেই মুখ!! সেই অবয়ব!!! স্বামিজী মৃদুস্বরে কহিলেন, "বালকটি কে?" এবং আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। কবিতে যেরূপ বর্ণনা করে আমার মনেও ঠিক তখন সেইরূপ হইতে লাগিল, "My ears have not yet drunk a hundred words of that tongue's utterance, yet I know the voice." ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে second sight (চকিত দর্শন) বলে, ইহা কি তাই? যুগপৎ হর্ষ, ত্রাস ও নানারূপ দ্বন্দ্বভাব আমার চিত্তকে প্রমথিত করিতে লাগিল। আমি কখন স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গীগণকে, কখন স্টেশন ও জনসমূহকে অস্পষ্টভাবে দেখিতে লাগিলাম; এবং কখন বা সব লয় হইযা যাইতেছে,—শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য! কোথায় যেন উড়িয়া যাইতেছি,—দেহ নাই, মন নাই, চিন্তা নাই; এরূপ নিস্তব্ধস্থানে থাকিতে পারিতেছি না। আবার স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় নামিয়া আসিতেছি এবং অস্পষ্টভাবে ও অর্ধ-নিদ্রিতাবস্থায় পূর্বস্থান ও মনুষ্যজনকে দেখিতেছি। কিছু

বলিতেছি না, কিছু বলিতে পারিতেছিও না। হস্তপদাদি রহিত হইয়াছে, বুদ্ধি-বিবেচনা তিরোহিত হইয়াছে, কর্তব্য অকর্তব্য একই হইয়াছে; কিন্তু অন্তরে নিশ্চল নিস্পন্দ আনন্দরাশি ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করিতেছে।

স্বামিজীর চরণে পুষ্প প্রদত্ত হইল, তিনি পার্শ্বস্থিত অপর ব্যক্তিদের দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং এর ওর সহিত বাক্যালাপ করিয়া প্রেমপূর্ণ নেত্রে আবার আমায় নিরীক্ষণ করিলেন। আমিও তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, এবং নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল। সময় হিসাব করিলে এক মিনিটের সহস্রাংশের একাংশ, কিন্তু স্বামিজীর নেত্র হইতে এক অপূর্ব ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি যেন অবাচনিক ভাষায় কহিতে লাগিলেন, "Deny thy father, deny thy name and for that which thou losest take all myself." পিতাকে ত্যাগ কর, নাম যশ ত্যাগ কর এবং এই ত্যাগের ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমাকে সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইবে। আমার প্রাণ, আমার অন্তস্থল যেন নড়িয়া উঠিল এবং যেন ভিতর হইতে গম্ভীরভাবে সিংহ গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, "I take thee at thy word", এই কথার মত তোমাকে গ্রহণ করিব। কবিতে যাহা বর্ণনা করে, আমি জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাই এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতেছি। ইহা যে ঠিক আনন্দ তাহাও নয় কিন্তু তাহার উপর যদি কিছু থাকে তাহাই আমি চকিতে দর্শন করিয়া-

ছিলাম, এবং সেই স্মৃতি ও চকিত-দর্শন আজও স্পষ্ট আমার চোখে ভাসিতেছে।

স্টেশন হইতে স্বামিজী কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাড়ীতে উঠিলেন এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর সহিত কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আসিয়াছিলেন—ওকাকুরা*, নির্ভয়ানন্দজী (কানাই), স্বামী বোধানন্দ (হরিপদ) এবং গৌর ও নাদু (বালকদ্বয়)। শিবানন্দ স্বামী ও নিরঞ্জনানন্দ স্বামী তখন কাশীধামেই অবস্থান করিতেছিলেন। ইহারা সকলেই একত্রিত হইয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের "সৌধাবাসে" অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন স্বামিজী, নিরঞ্জনানন্দ স্বামী, শিবানন্দ স্বামী ও ওকাকুরা প্রভৃতি সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন; আমি ও চারুবাবু তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সময় অপরাহ্ণ, স্বামিজী জনমণ্ডলীর সহিত নানারকম কথাবার্তা কহিতেছিলেন। মাঝে মাঝে ওকাকুরার সহিত ইংরাজীতে কথাবার্তা হইতেছিল, বিষয়টা বোধ হয় ভারত-ভ্রমণের। আমি সাষ্টাঙ্গে স্বামিজীকে প্রণিপাত করিলাম। যদিও ঘরে কয়েকটি সুখাসন ছিল, তথাপি স্বামিজীর সম্মুখে উচ্চাসনে উপবেশন করা অবিধেয়

---

* অক্রূরখুড়ো—অক্রূর যেমন মথুরা হইতে কৃষ্ণকে লইতে আসিয়াছিলেন সেইরূপ ওকাকুরা মহাশয়ও জাপান হইতে স্বামিজীকে লইতে আসিয়াছেন, সেই কারণেই আমরা তাঁহাকে অক্রূরখুড়ো বলিয়া থাকি।

মনে করিয়া আমরা নিম্নস্থ গালিচা বা আস্তরণের উপর বিনীত-ভাবে উপবেশন করিলাম। ইহা দেখিয়া স্বামিজী কথা বন্ধ করিয়া ঘন ঘন আমার দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাক্যেতে যত না হউক, মুখভঙ্গি ও দৃষ্টিতে স্নেহপূর্ণভাব অতিশয় প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমি একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলাম। স্বামিজী অতি স্নেহপূর্ণ করুণস্বরে যেন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন এইভাবে আমাদের উভয়কে পুনঃ পুনঃ অতি করুণ ও মিনতিস্বরে বলিতে লাগিলেন, "উঠে বস বাবা, উঠে বস।" বুঝিলাম যেন মানুষের ভিতর উঁচু-নীচু ভাব তাঁহার কষ্টদায়ক হইতে লাগিল। কারণ সকলের ভিতরেই সেই এক ব্রহ্ম এবং সকলেই এক আসনের অধি-কারী—ইহাই তাঁহার মুখভঙ্গি এবং কথাতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার সম্মুখে সুখাসনে গিয়া বসিলাম। এইরূপ প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণে ও আকর্ষণে স্বামিজীকে আমাদের এরূপ অন্তরের লোক বলিয়া প্রতীতি জন্মিল যে, আমরা তন্মুহূর্তে অজ্ঞাতভাবে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। ইহাই হইল আমাদের প্রকৃত দীক্ষার সময় ও দীক্ষার স্থল। জ্বলন্ত ও সুস্পষ্টভাবে সেই চিত্রটি সর্বদাই আমার চক্ষুর সম্মুখে বর্তমান রহিয়াছে।

রাত্রিকালে চারুবাবু, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও আমি স্বামিজীর আবাসে প্রায় থাকিতাম। ভোজনের সময় প্রায় সকলে একত্রে বসিতাম। ভোজনের সময় যে জিনিষটা সুস্বাদু

লাগিত, স্বামিজী অতি স্নেহপূর্ণভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্বহস্তে সেইটি তুলিয়া আমাদের পাত্রে দিতেন এবং তৎপ্রদত্ত বস্তুটি আমাদের সুস্বাদু লাগিয়াছে কিনা জানিবার জন্য আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন এবং আনন্দ করিয়া প্রশ্ন করিতেন, "কিরে, কেমন লাগলো, তোর ভাল লাগলো কি? খা, খা, বেশ করে খা, জিনিষটা আমার বেশ ভাল লেগেছে তাই তোকে দিচ্ছি।" জগৎমাতার সন্তানের প্রেম যে কি রকম এবং বাৎসল্যভাব কাহাকে বলে, দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া তাহা বিশেষ বুঝা যায় না। স্বামিজী এইরূপ মধুরস্বরে স্নেহ-পূর্ণভাবে নিজের পাত্রস্থ নিজের প্রীতিকর বস্তু আমাদের আদর করে খেতে দিতেন তাহাতে বাৎসল্য প্রেম যে কি তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা কেবলমাত্র প্রসাদ নয়— গভীর প্রেম; ভালবাসা পিণ্ডীকৃত হইয়া খাদ্যরূপ ধারণ করিয়া আমাদের মুখেতে আসিতে লাগিল। ইহাতে বস্তুর স্বাদত্ব বা স্বামিজীর প্রেম কোন্‌টার আধিক্য ছিল, ইহা প্রতীয়মান করা কঠিন।

আমরা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাসায় প্রথম প্রথম নিত্য যাতায়াত করিতাম এবং মাঝে মাঝে তথায় রাত্রিবাসও করিতাম। তখনকার সেবাশ্রম হইতে উক্ত বাড়ীটি পাঁচ মাইল দূর হওয়াতে আমরা সব সময় উপস্থিত থাকিতে পারিতাম না। একদিন শিবানন্দ স্বামী সকলকে দীক্ষা দিবার জন্য স্বামিজীর নিকট কথা উত্থাপন করেন। স্বামিজী

তাহাতে সম্মত হন কিন্তু তখন আর এ সম্বন্ধে কোন দিন নির্ধারিত হয় নাই। চারুবাবু এবং হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আমাকে স্বামিজীর নিকট পুনরায় কথা উত্থাপন করিতে বলায় আমি তাঁহার নিকট দীক্ষার বিষয় বলিলাম। তিনি রহস্য-চ্ছলে বলিলেন, "কেন, তোরা তো রামানুজী বৈষ্ণবভাবে দীক্ষিত, বিষ্ণুমূর্তি তো ভাল, তোর দীক্ষার তো আমি কোন প্রয়োজন বুঝছি না।" আমি বলিলাম, "আপনার ন্যায় যোগীর নিকট আমার দীক্ষা নিতে ইচ্ছা।" এই কথায় তিনি হাসিয়া সম্মত হইলেন। ইহার পর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার তিরোধান হওয়ায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই; যেন বন্দুকের গুলি আসিয়া আমার হৃদয় বিদ্ধ করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎই শোকের উপশম হইল। আমার মনে হইল ইহা স্বামিজীর বিশেষ কৃপা।

নির্ভয়ানন্দ স্বামী স্বামিজীর আহারের আটা আনিবার জন্য আমায় একটি টাকা দিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি শোকসন্তপ্ত হৃদয়েও আশ্রমে আটা লইয়া গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম পাছে স্বামিজীর কষ্ট হয়। স্বামিজীর প্রতি আমার অনুরাগ এত প্রগাঢ় হইয়াছিল যে, আমি ভ্রাতৃবিয়োগজনিত সমস্ত কষ্ট ভুলিলাম। কিছুদিন পরে আমি স্বামিজীর নিকট যাই এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাকি ভাই মারা গেছে? তোর কিরূপ বোধ হ'ল, মাকে কি বললি?" প্রত্যুত্তরে আমার মনের অবস্থা এবং সমস্ত ঘটনা

যথাযথ তাঁহাকে নিবেদন করাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার ভায়েদের যদি এমন হ'ত আমার কিন্তু বড় কষ্ট হ'ত।" এই কথা তিনি এমন কাতরভাবে বল্লেন যে, তাহাতে আমাব মনে যে অল্প কষ্ট ছিল তাহাও মুছিয়া গেল। বুঝিলাম ইনিই আমার প্রকৃত সখা ও সুহৃদ এবং তদবধি তাঁহার চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম।

আমাব ভ্রাতার ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া হইবার পূর্বেই স্বামিজী আমাদিগকে সেইস্থানে রাত্রিবাস করিতে আদেশ কবেন, এবং আমার এই অশৌচ অবস্থা সত্ত্বেও আমাদিগকে প্রাতে স্নান করিয়া দীক্ষা লইবাব জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। আমরা স্নান কবিযা ও বস্ত্র পবিযা সংযতভাবে রহিলাম এবং স্বামিজীর আদেশ ও আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতি-বিলম্বে স্বামিজী আমাদের সকলকে যাইতে আহ্বান করিলেন। চাকবাবু আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। আমি যাইযা দেখিলাম স্বামিজী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "তুই প্রথম এসেছিস, আয় চলে আয়।" এই বলিযা আমাকে একটি ছোট কক্ষে লইয়া গেলেন, তারপর নিজে একটি আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে আর একটি আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন।

স্বামিজী অল্পক্ষণের ভিতর ধ্যানস্থ হইয়া সবিকল্প সমাধিতে চলিয়া গেলেন—শরীর স্থির, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিস্পন্দ, মেরুদণ্ড উন্নত, নয়ন স্তিমিত ও জ্যোতিঃপূর্ণ; বদনমণ্ডল, ভাব শক্তি প্রেম

ও আনন্দে উচ্ছলিত হইতেছে, কিন্তু গাম্ভীর্যের ভাব অপর সকল ভাবগুলিকে ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যে স্বামিজী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং আহ্লাদ করিয়া আমাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন সে স্বামিজী আর এক্ষণে নাই। পূর্বদেহ, পূর্বকান্তি এবং পূর্বভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আসনে উপবিষ্ট। যে পুরুষ জগৎকে পদদলিত করিতে পারিতেন, উচ্চ উচ্চ ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে পারিতেন, অভয়বাণী শুনাইয়া ম্রিয়মাণ জগৎকে গর্জন করাইতে পারিতেন, এবং মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার করতলামলকবৎ সেই মহাশক্তিমান পুরুষ স্বামিজীর স্থূল দেহাভ্যন্তর হইতে জাগ্রত এবং সুস্পষ্টভাবে আবির্ভূত হইয়া বিকাশ পাইতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ সমাধিতে অবস্থান করিয়া তিনি মনকে নিজবশে আনয়ন করিলেন এবং দক্ষিণ কর দিয়া আমার দক্ষিণ কর গ্রহণ করিয়া কয়েক মুহূর্ত তদবস্থায় রহিলেন। তারপর তিনি আমার পূর্বতন বিষয় সকল বলিতে লাগিলেন, "তোর ছাপরায় যাবার সময় স্টীমারে কাহারও কথা শুনিয়া প্রথম কী জ্ঞান হইয়াছিল?" আমি বলিলাম, "আমার স্মরণ নাই।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা মনে করে দেখিস।" তাহার পর তিনি আমাকে তাঁহার (স্বামিজীর) মূর্তি ধ্যান করিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ পরে বলিলেন, "মনে কর আমার রূপটি ঠাকুরের রূপ হইয়া গিয়াছে, তারপর ঠাকুরের রূপ বিগলিত হইয়া

গণেশের রূপ হইয়া গেল।" তখন তিনি আদেশ করিলেন, "তুই ঠাকুরের বাহ্যপূজা মাঝে মাঝে করবি, আর মানসপূজা রোজ করবি।" স্বামিজী যখন আমার করস্পর্শ করিয়াছিলেন তখন আমার মন হইতে সকল বাসনা, সকল চিন্তা তিরোহিত হইয়াছিল। ইচ্ছাও নাই, অনিচ্ছাও নাই—বাসনাও নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই; ভক্তি মুক্তি সকলই তিরোহিত হইয়াছে। সব শান্ত, জগৎ শান্ত, স্থির ধীর। সৃষ্টি আছে, সৃষ্টি নাই; আনন্দ পরিপূর্ণ। আনন্দের উপব এক বস্তু ছিল যাহা আমি ভাবায় বর্ণনা করিতে অক্ষম—তাহাই আমি উপভোগ কবিতে লাগিলাম। শান্তি, শান্তি, মহাশান্তি—সর্বব্যাপী শান্তি। হিংসাদ্বেব উঁচু-নীচু ইত্যাদির কোন সম্পর্ক বা নামগন্ধ তথায় নাই। এক মহাশান্তির ব্যোমের মধ্যে যেন উড়িয়া গেলাম এবং তথায় স্থির হইয়া অচল অটলভাবে বসিয়া রহিলাম। ইহা শূন্য অথবা পূর্ণ কিছুই নয়! আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বোধগম্য হইবারও বিষয় নহে, কারণ বোধ চিত্তচাঞ্চল্য হইতে উদ্ভূত হয়। অসীমশান্তি ব্যোমে সর্বব্যাপ্ত। মূর্তি, রূপ সেখানে কিছুই নাই।

"কভু একাকার, নাহি আর কালের গমন;
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
স্থির—স্থিব সমুদয়,
নাহি—নাহি ফুরাইল বাক্;
বর্তমান বিরাজিত।"

আলোক ডুবিল, অন্ধকার তিরোহিত হইল,—নাহি রাত্র, নাহি দিবা, নিস্পন্দ সৃজন।

সেই সময় হইতে এই শান্তিপূর্ণ ব্যোম, যাহা স্বামিজী আমাকে দেখাইয়াছিলেন সেইটি ধ্যান করিতে আমার ভাল লাগে, মূর্তি বা রূপ ধ্যান করিতে তত ইচ্ছা হয় না। কারণ ইহাতে একটু কল্পনা বা সীমা ও পরিধির আভাস থাকে। "মহাব্যোম, যথায় গ'লে যায় রবি শশী তারা" সেইটি আমার বড় প্রিয়। ইতঃপূর্বে আমি মূর্তিপূজা করিতাম এবং তাহাই আমার বড ভাল লাগিত কিন্তু স্বামিজী করস্পর্শ করাতে আমি সেই মহাব্যোম-ধ্যানপ্রিয় হইযা গিয়াছি। যাহাকে যোগীরা সবিকল্প সমাধি বলেন এবং যাহা প্রাপ্ত হইতে বহু বৎসরের প্রযোজন, মাত্র স্বামিজীর করস্পর্শে আমার মন যেন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি তখন গৃহ দেখিতে পাইতে-ছিলাম না, নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিতে পাইতেছিলাম না, সম্মুখে স্বামিজী আমার গুরু, তাঁহাকেও পর্যন্ত দেখিতে পাইতে-ছিলাম না। সমস্তই এক মহাশূন্যে পর্যবসিত হইয়াছে। খণ্ডত্বের বা বহুত্বের কোন জ্ঞান নাই, অন্তর বাহ্য ব'লে কোন শব্দ নাই। আমার শরীর নিশ্চল ও নিস্পন্দ—কোন চিন্তা নাই—কোন ভাব নাই। এমন কোন শব্দ ভাষায় নাই যাহার দ্বারা সেই ভাব ও অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারি।

"নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে, ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥

অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ—
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ বোঝে—প্রাণ বোঝে যার।”

তদবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম তাহা আমার মনে নাই। ক্রমে ক্রমে দেখিলাম, আমার মন সেই উচ্চাবস্থা হইতে নামিয়া দেহে প্রবেশ কবিতেছে, তখন অস্পষ্টভাবে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গৃহ ও অপরাপর বস্তুর আভাস মাত্র দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনটিই ঠিক বলিয়া তেমন বুঝিতে পারিতেছিলাম না। যেন জগৎ নূতন, গৃহ নূতন, সবই নূতন! আবার মন যেন সেই মহাব্যোমে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দেহস্থ শক্তি তাহা প্রতিরোধ করিতেছে। এই নিদ্রিত-জাগ্রত অবস্থায় থাকিয়া আমার শরীরে উষ্ণতা আসিতে লাগিল। ধমনীতে ধীরে ধীরে শোণিত বহিতে লাগিল এবং বাহ্যবস্তুসকল ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। স্বামিজী ও আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল আবার স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু একটি নূতন জিনিষ প্রকাশ পাইল—যেন সকল বস্তুর উপর এক মাধুর্য ও শান্তি বিরাজমান। প্রত্যেক বস্তুই যেন অতি পবিত্র, প্রত্যেক বস্তুই যেন আমার অতি প্রিয় ও প্রণম্য। আমি

দেখিলাম বায়ু পবিত্র, আকাশ পবিত্র, জল পবিত্র, চতুর্দিক পবিত্র, প্রত্যেক সৃজিত জীব পবিত্র।

ক্ষণকাল পরে স্বামিজী আমাকে অন্য লোক পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুমতি করিলেন। তাহার পর চারুবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহারও পূর্ববৎ দীক্ষা হইল, পরে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়েরও দীক্ষা হইল।

বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে শক্তিসঞ্চার বা 'transmission of power'-এর বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানদিগের মধ্যে 'বিশপ' বা মহান্ত হইবার সময় অপর মহান্তসকল আসিযা নূতন ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া ভগবানের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং শেষে সকলে নূতন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করিযা থাকেন। ইহাকে 'consecration' বলা হয। পূর্বতন প্রথানুযাযী এখনও পর্যন্ত এইরূপ প্রক্রিয়া হইয়া থাকে এবং উহা এক্ষণে প্রাণহীন আচার-পদ্ধতিতে পরিণত হইযাছে। সাধারণ লোকের ধারণা যে, ধর্ম মানে কতকগুলি আচারপদ্ধতি। কতিপয আচারপদ্ধতি অনুসরণ করিলেই ধর্মার্জন করা হয়। ইউরোপীয় ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া এতদ্দেশীয় লোকেরা মনে করেন, তর্কবিতর্ক বা বাক্যবিন্যাসই হইল ধর্ম। উচিত অনুচিত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করা ও তদনুযায়ী অপর সকলকে বিচার করা এবং ন্যূনতা ও হীনতা অনুযায়ী অপর সকলের বিষয পরিমাপ করাকেই ধর্ম কহে। কিন্তু ইহা ব্যতীত এক স্বতন্ত্র বস্তু

আছে, তাহা কখনও ইঁহারা অনুভব করেন নাই। গ্রন্থপাঠে ধর্ম নাই। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরই কাছে কেবল ধর্ম আছে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই কেবল অপরকে ধর্ম দেখাইতে ও দিতে পারেন। যেরূপ দ্রব্যসামগ্রী হাতে করিয়া ধরা যায়, অনুভব করা যায়, খাদ্য হইলে খাওয়া যায় এবং এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারে, ধর্মও ঠিক তদ্রূপ স্পর্শনীয় জিনিষ। ইহাকেই প্রাণ বলে। কেবল সেই ব্যক্তি ধর্ম দিতে ও দেখাইতে পারেন, যিনি আপনার ভিতর এই প্রাণ, শক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দেহের গভীরস্তরে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম স্নায়ুতে যখন শক্তি প্রবুদ্ধ হয় তখন জগৎ ও বস্তুসমুদয়ের সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়। দার্শনিকেরা ও বৈজ্ঞানিকেরা যে-সকল মহাসত্য আবিষ্কার করেন, তাহা মনকে এই ব্যোম বা চিদাকাশে তুলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সবিকল্প সমাধিতে মন রাখিলে তবে তার খণ্ডত্ব ও পূর্ণত্ব জ্ঞানের উপলব্ধি হয়।

ধর্ম যে জীবিত ও প্রত্যক্ষের বিষয়, স্বামিজীর কৃপায় ও করস্পর্শে তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিলাম, এবং অপরাপর দেয় বস্তুর ন্যায় ইহা স্পষ্ট হাতে হাতে পাইলাম। শব্দ, তর্ক, বিদ্যা, বুদ্ধি, কিছুই তথায় নাই, সব লয় হইয়া গিয়াছে; সবই এক—এক—এক জীবন্ত। জীবন্ত বা এক চিৎ অসীমভাবে বিরাজ করিতেছে। আবার পরক্ষণে

দেখিলাম—সেই অসীম প্রাণ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের সৃষ্টি হইতেছে। সকলের ভিতরেই সেই এক প্রাণ; অসীম সসীম ও সসীম অসীম। রূপ দেখি, অবয়ব দেখি—রূপ দেখিলে অসীমকে দেখিতে পাই না, যদিও রূপের ভিতরেই অসীম রহিয়াছে, কিন্তু আবার যখন অসীম দেখি তখন নাম রূপ দেখিতে পাই না। কিন্তু পর্যায়ক্রমে এক হইতে অপরটি কিরূপে ধারাবাহিক ভাবে আসিতেছে তাহা আমি বিশেষ বুঝিতে পারিলাম না। কারণ এই গুরুতর ব্যাপারটি এত চকিতের ভিতর হইতে লাগিল যে, আমি ভাবিবার বা চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম না। শুধু স্বামিজীর কৃপায় এই মাত্র বুঝিলাম যে, ধর্ম জীবন্ত বস্তু; ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, ছুঁইতে পাওয়া যায়।

মহাত্মাদিগের নিকট শুনিযাছি যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভিতর এই শক্তিটি প্রবল ছিল। তিনি ইচ্ছামাত্র অপরের মনটিকে উচ্চস্তরে লইযা যাইতে পারিতেন, এবং তর্ক-যুক্তির অতীত স্থানে মন তুলিয়া দিয়া প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত প্রাণ-শক্তি দেখাইতে ও সঞ্চার করিতে পারিতেন। ইহাকেই দীক্ষা বলে। কিন্তু স্বামিজীর ভিতর এই শক্তিটি আমি স্পষ্ট-ভাবে দেখিয়াছি। শক্তি সঞ্চার করিতে না পারিলে তাহাকে প্রকৃত দীক্ষা বলা যাইতে পারে না।

আমাদের দীক্ষার পর আমরা সেই স্থানে আহারাদি করিলাম এবং তৎপরে সেবাশ্রমের কার্যের জন্য চলিয়া

আসিলাম। এই সময় স্বামিজীর ভাব লইয়া তিন বৎসর পূর্বেই একটি সেবাশ্রম গঠিত হইযাছিল এবং কার্যও সামান্যভাবে চলিতেছিল। সেবাশ্রমের কর্মীদের সাধুগিরি বা অপর স্থানে ভিক্ষা করিয়া খাইয়া সেবাশ্রমের কাজ করাতে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। স্বামিজীর প্রিয় কার্যেতে বালকেরা প্রাণপাত করিতেছে; তাহাদের অর্ধাশনে শরীর কৃশ হইতে লাগিল দেখিয়া স্বামিজী মনে বড় ব্যথা পাইলেন। স্বামিজী সকলকেই ভালভাবে আহার করিতে এবং মাছ মাংস ভক্ষণ করিয়া শরীর সবল ও পুষ্ট রাখিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে, এ কার্য আমাদিগকে করিতেই হইবে। তেজস্কর আহার না করিলে রোগীর সেবা ভালরূপ চলিবে না। এইজন্য স্বামিজী তাঁহার সহিত আমাদিগকে আহার করিতে বলিতেন। এই সময়ে কেহ কেহ স্বগৃহে আহার করিতেন, সেইজন্য তাঁহার সহিত আহার করিবার জন্য আমাদিগকে বারংবার আজ্ঞা করিতেন এবং আমরাও মাঝে মাঝে সুবিধা পাইলেই তাঁহার সহিত আহার করিতে যাইতাম।

আমাদের মধ্যে একটি বালক কৃশ ছিল। স্বামিজী তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়াছিলেন। স্বামিজীর সেবাশ্রমের কর্মীদের উপর কিরূপ দয়া ও স্নেহ ছিল তাহা এই বালকটির উপাখ্যান বিবৃত করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

এই সময় জনৈক অল্পবয়স্ক যুবক দেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যুবকটি অনন্যোপায় হইয়া আশ্রমের কর্মে যোগ দিল। তাহার শরীর দুর্বল ও রুগ্ন ছিল। যুবকটি একদিন স্বামিজীকে দর্শন করিতে যায়। স্বামিজী তাহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া তাহার সমস্ত পরিচয় লইলেন। শরীর রুগ্ন ও কৃশ দেখিয়া স্বামিজী ব্যথিত ও উন্মনা হইয়া পড়িলেন এবং মধুরস্বরে তাহাকে বলিলেন,—"বাবা, তোমার শরীরটা বড দুর্বল, তুমি প্রত্যহ দিনের বেলা এখানে এসে খাবে, পেটে না খেলে কাজ করা যায় না; তা তুমি রোজ দুপুরবেলা এসে আমার সঙ্গে খাবে।" যুবকটির সেবা-শ্রমের কাজ করিয়া আসিতে কখন কখন বিলম্ব হইত। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ, তাঁহার সময়মত স্নানাহার না হইলে পীড়া বৃদ্ধি পাইত। সেইজন্য সকলে তাঁহাকে সময়মত স্নানাহার করিতে বলিতেন। বহুমূত্র রোগীর আহারের অনিয়ম হইলে শরীর বিশেষ খারাপ হয়। ডাক্তার ও তাঁহার গুরুভায়েরা সর্বদা তাঁহাকে আহারের বিষয় নিয়মিত হইবার জন্য মিনতি করিতেন এবং স্বামিজীও সে বিষয় বিশেষ বুঝিতেন। কিন্তু স্নেহ এমনই জিনিষ, এমনই তাহার প্রবল শক্তি যে, বিধি নিয়ম ও পীড়ার বৃদ্ধি কিছুই সে মানে না; সকল নিষেধ অতিক্রম করিয়া নিজের প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যুবকটির জন্য স্বামিজীর মন আহারের পূর্বে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিত।

সর্বদাই তিনি পাদচারণ কবিতেন এবং প্রতীক্ষা করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেন, দরজার দিকে ও রাস্তার দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিযা থাকিতেন; এবং যে সম্মুখে আসিত তাহাকেই কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেন, "ছেলেটি কি এসেছে? আজ এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? আহা, ছেলেটা এত বেলা পর্যন্ত কিছু খায় নি, রোগা শরীর, অল্প বয়স, তারপর এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি", ইত্যাদি।

কোন অতীব মহৎ কার্যে যদি বিশেষ শক্তি ও মনোনিবেশ আবশ্যক হয়, সেই সব কার্যে স্বামিজী যেমন চিত্ত নিবিষ্ট করিযা স্থির গম্ভীর স্নেহপূর্ণ উন্মনাবস্থা হইযা থাকিতেন, এই যুবকটির আহারের বিলম্বনিবন্ধনেও তিনি সম্পূর্ণভাবে সেই ভাব প্রকাশ করিতেন। সেই উন্মনা ভাব, যেন কোন অভীষ্ট বস্তু লাভ হইবে এইরূপ ভাবে প্রতীক্ষা করিতেন। ছোট বা বড় কার্য তাঁহার কাছে ভিন্ন ছিল না। সভায দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা, পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে বেদান্ত চর্চা করা, উচ্চ অঙ্গের ধ্যান-ধারণা করা এবং এই ছেলেটিকে ভোজন করান সবই তাঁহাব কাছে এক ছিল—একই মন, একই ক্রিযা, একই সিদ্ধিলাভ।

আহারের নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে বিশেষ অনুনয় করিতেন। হয়ত তাঁহার স্নান সমাপন হইযাছে, শুষ্ক বস্ত্র পরিয়াছেন এবং আহার্যসামগ্রী সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে; অপর সকলেই আহারের জন্য বড় ব্যগ্র ও চঞ্চল হইয়া

পড়িয়াছেন কিন্তু স্বামিজীর পূর্বে কেহই ভোজন করিতে ইচ্ছুক নন।

মনে মনে সকলেই উদ্বিগ্ন হইতেছেন, স্বামিজীর সে দিকে কোন দৃক্‌পাত নাই; তাঁহার সে বিষয়ে কোন স্মরণই নাই। স্বামিজী পাদচারণ করিতেছেন এবং নানা প্রকার ভঙ্গি করিয়া মনের তীব্র ভাব প্রকাশ করিতেছেন; ওষ্ঠ, নেত্র, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আবেগের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যেন কোন প্রিয়বস্তুর অদর্শন হেতু উন্মনা ও ব্যথিত হইয়া সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং অনিমেষ নয়নে পথের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি করিতেছেন:

"আকুল বেণী, ধাইল রাণী,
ঘনশ্বাস বহে তাহে,
ননী লয়ে করে, স্তনে ক্ষীর ঝরে,
অনিমিখ পথ চাহে।"

বাৎসল্য-প্রেম যে কিরূপ তীব্র আবেগ হৃদয়ে আনে তাহা স্বামিজীর ভিতরে আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি। বৈষ্ণব গ্রন্থে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিতেন তাহা আমরা উক্ত গ্রন্থাদি পড়িয়া যা না বুঝিতে পারিয়াছি স্বামিজীর ভাব দেখিয়া তাহা আমরা স্পষ্ট হৃদয়ে অনুভব করিলাম।

অবশেষে ছেলেটি ক্ষিপ্রগতিতে প্রবেশ করিল। বৎস-হারা ধেনু পুনরায় বৎস পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়,

বালকটিকে দ্বারদেশে দেখিয়া স্বামিজীর মুখভাব তদ্রূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। চিন্তিত, কুঞ্চিত ও উদ্বিগ্ন ভাব তিরোহিত হইল, মুখ হরষে পরিপূর্ণ হইল, স্মিতমুখে মধুরস্বরে স্বামিজী বালকটিকে প্রশ্ন করিলেন, "কি রে বাবা, এত দেরী হ'ল কেন? কাজ বড্ড পড়েছিল নাকি? সকালে কিছু জল খেয়েছিলি ত? তোর জন্য এখনও আমি কিছু খাই নি; আয়, হাত পা ধুয়ে নে, শিগ্‌গির শিগ্‌গির খাইগে চল। আমাব শরীর অসুস্থ। সময়মত না খেলে অসুখ বাড়ে। একটু সকাল সকাল আসবার চেষ্টা করবি—তবে কাজের ঠেলা কি করবি বল।"

বালকটি যদিও কথা কহিয়া কোন কৃতজ্ঞতা বা আনন্দে প্রকাশ করিতে পারিল না কিন্তু নয়ন দিয়া সরলভাবে স্বামিজীকে ক্ষণে ক্ষণে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং সে যে ইহাতে বিশেষ অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইয়াছে, তাহার নম্র মুখ, লজ্জিত অধোবদন ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সকলেই তাহা বুঝিতে পারিল। স্বামিজী বালকটিকে আপনার পশ্চাতে লইয়া আহার করিতে গেলেন। সকলে উপবেশন কবিলে স্বামিজী বালকটির দিকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখিলেন এবং আপনার পাত্র হইতে সুস্বাদু জিনিষ লইয়া বালকটির পাত্রে দিতে লাগিলেন। বালকটি নির্বাক ও আনন্দে পুলকিত হইয়া তাহা অতীব দুর্লভ অমৃততুল্য বস্তু বোধ করিয়া আহার করিতে লাগিল। যতক্ষণ পেটে

ধরিতে পারে ততক্ষণ স্বামিজী নিজের পাত্র হইতে উঠাইয়া সুস্বাদু মিষ্ট জিনিষ তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। নিজে কিছু খাইলেন কি না তাহা একবারও তাঁহার মনে উদয় হইল না। হয়ত নিয়মিত আহারেরও কিঞ্চিৎ কম হইল; কিন্তু নিরাশ্রয় গরীবদের সেবা করা এবং বালকটি নিরাশ্রয় ও অল্পবয়স্ক বলিয়া ইহাকে আহার করান যেন স্বামিজীর মহৎ কার্য। স্বামিজী এই কার্যে আনন্দিত ও পুলকিত হইয়া আপনার আহার বিস্মৃত হইয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে নিজ নিজ খাদ্য খাইতেছিলেন—স্বামিজীর প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ ও বালকটি আহার করিতেছে দেখিয়া, স্বামিজীর আনন্দ ও মুখচোখের ভাবভঙ্গি দেখিয়া—তাঁহারা নিজ নিজ আহার্যের বিষয় বিস্মৃত হইযা স্বামিজী ও বালকের ভোজনলীলা দেখিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে আনন্দ করিয়া স্বামিজীকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, "স্বামিজী, আপনার আহার হইতেছে না, আপনি একটু আহার করুন।" কিন্তু কাহাকেই বা বলিতেছেন, কেই বা শুনিতেছেন! স্বামিজী যেন আত্মহারা হইযা বালকটিকে ভোজন করাইতেছেন, যেন প্রত্যক্ষ গোপালকে আহার করাইতেছেন, শুধু অভ্যাসবশতঃ মাঝে মাঝে নিজে খাইতেছেন। ভোজন-গৃহটি যেন আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহা মানবলীলা কি দেবলীলা তাহা বিচার করা সুকঠিন। আনন্দ আনন্দকেই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আনন্দ স্বয়ংই প্রত্যক্ষ বস্তু, আহার ত নিমিত্ত মাত্র। এরূপ

আনন্দের ভোজন পূর্বে কখনও দেখি নাই বলিয়া মনে সর্বদাই ইহা জাগরূক রহিয়াছে।

একদিন অপরাহ্ণে স্বামিজী এক পর্যঙ্কে বসিয়া আছেন এবং শিবানন্দ স্বামী আর এক পর্যঙ্কে বসিযা আছেন। গৃহমধ্যে অপর কযেকটি লোকও ছিলেন। তাঁহাদের নাম এখন বিশেষ স্মরণ নাই। উভয়ের মধ্যে হাসি-তামাসা অনেকক্ষণ পর্যন্ত হইতেছিল। স্বামিজীর মুখ হাসিতে পরিপূর্ণ, চোখ-মুখ দিযা হাসি যেন ফুটিযা পডিতেছে। অল্পবয়স্ক বালক নূতন কৌতুক শুনিলে যেমন অধীর হইযা হাস্য করে, স্বামিজীও ঠিক তদ্রূপ করিতেছেন। স্বামিজী বলিতেছেন, "কি বলেন মহাপুরুষ, আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য—এঁ্যা—এঁ্যা, ঠিক না?" বলিযা আরও উচ্চৈঃ-স্বরে হাসিতেছেন এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গি করিতেছেন। স্বামিজীর নেত্রের একটি সূক্ষ্ম স্নায়ু নষ্ট হইযা যাওযায় তাঁহার দৃষ্টি কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল, এবং শুক্রাচার্য যেমন দৈত্যগুরু ছিলেন স্বামিজীও তদ্রূপ বিদেশীয়-দিগের গুরু হইযাছিলেন। এই নিমিত্ত আপনাকে একচক্ষু শুক্রাচার্যের সহিত তুলনা করিয়া নানারূপ ব্যঙ্গ ও কৌতুক করিতেছিলেন। শিবানন্দ স্বামীও মাঝে মাঝে "আজ্ঞে তা ত বটেই, আজ্ঞে তা ত বটেই" বলিয়া হাস্য করিতেছিলেন। স্ফূর্তি, আনন্দ, হাস্য ও পরিহাসের 'হ্যাযোড়' উড়িতেছিল। হাসি যেন মুখ থেকে বেরিয়ে মেঝের উপরে গড়াইতেছিল

এবং লোকের গায়ে মাখামাখি হইতেছিল। স্বামিজীর এরূপ পরিহাসমুখ আমি আর কখন দেখি নাই। মাধুর্য, শুদ্ধতা, বালকভাব এবং অকপট মনোভাব সব যেন একভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। স্বামিজীর গম্ভীর ও শান্ত মূর্তি অনেক দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ আনন্দপূর্ণ কৌতুকমিশ্রিত হাস্যমুখ আর কখনও দেখি নাই। সাধারণ সাংসারিক লোক হাস্য করিলে তাহার ভিতর একটা বিরক্তি বা অবজ্ঞার ভাব থাকে, মনেতে চাপল্য বা অন্য কোন প্রকার বিকৃতি-ভাব আনয়ন করিয়া দেয়। কিন্তু দেখিলাম যে, স্বামিজীর সেই কৌতুক ও রহস্যময় ভাবগুলির ভিতর এক গম্ভীর ভাব মনকে উচ্চপথে লইয়া যাইতেছে। হর্ষ ও ভাবোচ্ছ্বাস, ইহাও যে ঈশ্বর লাভের এক পন্থা তাহা আমরা পূর্বে জানিতাম না; এক্ষণে স্বামিজীর কৃপায় বেশ বুঝিতে পারিলাম।

বৈষ্ণব কবিরা হ্লাদিনী শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং বিরহ, মিলন, রাস, অভিসার প্রভৃতি নানা-প্রকাব ভাবেবও বর্ণনা করিযা থাকেন। বেদান্ত ও অপর শ্রুতিমার্গ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া চিত্তকে ঊর্ধ্বদিকে লইয়া যাইতে আদেশ করেন। কেবল বৈষ্ণব কবিরাই বলেন, চাপল্যের ভিতর মাধুর্য ও হ্লাদিনী শক্তি পাওযা যায়। তাঁহারা বলেন, হ্লাদিনী, সঙ্গিনী, সম্বিৎ,—অর্থাৎ হ্লাদিনী আসিলে ভক্তি, জ্ঞান, সকলেই সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। লীলাকে

বুঝিতে পারিলে নিত্য অবশ্য আসিবে। কারণ, লীলা ব্যতিরেকে নিত্য থাকিতে পারে না এবং নিত্য ব্যতিরেকে লীলা থাকিতে পারে না। নিত্যই লীলা হয় আবার লীলাই নিত্যে পরিণত হয়।

এই সকল ভাব আমরা শুনিতাম এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতেও পড়িয়াছিলাম; কিন্তু পড়িয়া কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। অনেক সময় অযুক্তিকর বলিয়া আমরা অনেক জায়গায় প্রত্যাখ্যান করিতে প্রয়াস পাইতাম। কিন্তু স্বামিজীর অভূতপূর্ব হাস্য ও ব্যঙ্গ দেখিয়া এবং মাঝে মাঝে মহাপুরুষের আনন্দময় অনুমোদনবাক্য শুনিয়া নিত্য ও লীলার বিষয় যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। স্বামিজীর হাস্য-কৌতুক ও পরিহাসের ভিতরেও যেন ব্রহ্মজ্ঞান ও জীবের প্রতি মহা আকর্ষণভাব স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। যেন সমস্ত জীবকে নিজের ভিতর আকর্ষণ করিতেছেন, এবং তথায় রাখিয়া আপনার বর্ণে তাহাদিগকে রঞ্জিত করিয়া আবার প্রত্যেককে যথাস্থানে প্রেরণ করিতেছেন। আমার মনটিকে তিনি ঠিক সেইরূপ করিলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিসকলকেও হাস্য-রহস্য ও ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া ঠিক সেইরূপ রঞ্জিত করিয়া দিলেন। গম্ভীর, রুদ্র ও প্রচণ্ডভাবে যেখানে স্বামিজী আত্মশক্তির বিস্তার ও পরিচালনা করা বিবেচনা করিতেন না, সেইখানে তিনি কৌতুক, ব্যঙ্গ ও পরিহাস করিয়া বিবেকানন্দত্ব সাধারণের ভিতর উদ্ভূত

করিয়া দিতেন। হাস্যকৌতুকও যে ঈশ্বরলাভের সোপান-পরম্পরা ইহা তিনি প্রতীয়মান করিয়া দিতেন।

সাধারণের ধারণা যে, ধর্মকর্ম করিলে শুষ্কমুখ, রুক্ষ-কেশ, ম্লানবদন ও জীর্ণশীর্ণকলেবর হইতে হয়। হাসি তামাসার পাড়া দিয়া যাইতে নাই, তার নাম-গন্ধ মাত্রটিও করিতে নাই, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে এবং সব সময় মেজাজ টং করিয়া রাখিবে। সব সময় কায়দা-দোরস্ত গুরুগিরি বোল ঝাড়িবে—এই হইল ধর্ম। কিন্তু স্বামিজী অনেক সময় বলিতেন এবং অনেক সময় নিজের জীবনে দেখাইতেন যে, হাস্য-রহস্য মনের উন্নতির এক প্রধান সহায়। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "Witticism is the sign of intell gence." এই নিমিত্ত তিনি অতি কৌতুকপ্রিয় ছিলেন।

স্বামিজীর কৌতুক দেখিযা আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তিনি কৌতুকে মাতিযাছিলেন। আমি প্রণাম করিতে যাইলে যদিও অপর সময় বিনীতভাবে আমায় "থাক থাক বাবা, থাক" বলিযা নিবেধ করিতেন কিন্তু সেইদিন আমি পূর্বে বৈষ্ণবভক্ত ছিলাম ইহা তাঁহার স্মরণ হওয়ায় আমাকে বলিলেন, "কিরে, রামানুজী ঢঙে প্রণাম কর।" শিবানন্দ স্বামী বলিলেন, "ওর পায়ে বাত যে, ওরূপ প্রণাম করতে ওর কষ্ট হবে।" স্বামিজী প্রত্যুত্তর করিলেন, "ও কিছু নয়, ওসব কিছু নয়, ও সেরে যাবে। তুই প্রণাম কর, প্রণাম

কর।" আমি সাষ্টাঙ্গ হইয়া এবং হস্তদ্বয় লম্বমান করিয়া মেঝের উপর লম্বা হইয়া প্রণাম করিলাম। তাহাতে তিনি হাসিয়া খুব কৌতুক করিতে লাগিলেন।

এরূপ কথোপকথন ও হাস্য-রহস্য হইতেছে এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া বলিলেন যে, কাশীর কেদারনাথের মহান্ত মহারাজজী স্বামিজীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। শ্রবণমাত্রই স্বামিজী তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসাইতে বলিলেন এবং সেই হাস্যোৎফুল্ল বদন সহসা তিরোহিত হইয়া তাহার পরিবর্তে স্থির ধীর গম্ভীর ও আজ্ঞাপ্রদ মুখ ও প্রদীপ্ত নয়নদ্বয় আবির্ভূত হইল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি দেহাভ্যন্তর হইতে প্রকাশিত হইল। তখন আর কাহারও হাস্যকৌতুক করিবার সামর্থ্য রহিল না। সকলেই স্ব স্ব স্থানে সংযত হইয়া বসিতে লাগিল। গৃহের পূর্বভাব পবিবর্তিত হইয়া তেজঃপূর্ণ নিস্তব্ধ বায়ুতে পর্যবসিত হইল। যেন সেই গৃহমধ্যে হাস্যকৌতুক পূর্বে কখন হয় নাই এবং উপস্থিত লোকেরাও যেন কেহ হাস্যকৌতুক করে নাই। নিমেষমধ্যে ঘনভাব প্রবর্তিত করিয়া দিলেন; আবার আর একজন স্বামী বিবেকানন্দ হইয়া উঠিলেন। আমার যেন বোধ হইতে লাগিল,—"নূতন গগন যেন নব তারাবলী, নব নিশাকান্তকান্তি।"

যে ঘরে কেদারের মহান্তজীকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল, স্বামী শিবানন্দকে লইয়া স্বামিজী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরাও তাঁহার পদানুসরণ করিলাম।

স্বামিজী গৃহে প্রবেশ করিলে কেদারের মহান্ত অতি সম্ভ্রমে 'নমো নারায়ণ' কহিলেন এবং ভক্তিপূর্ণ স্তবপাঠের ন্যায় স্বর করিয়া স্বামিজীকে সম্বর্ধনা ও বন্দনা করিতে লাগিলেন। মহান্তজী আপন দক্ষিণী ভাষায় বলিতে লাগিলেন এবং সঙ্ঘের জনৈক সিংহলী সন্ন্যাসী ইংরাজী ভাষায় তাহা অনূদিত করিতে লাগিলেন এবং স্বামিজীও তাহার যথাযোগ্য উত্তর দান করিতে লাগিলেন। মহান্তজী কহিলেন, "আপনি সাক্ষাৎ শিব, আপনি জীবের মঙ্গলার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। আমেরিকা ও ইউরোপে আপনি যেরূপ কার্য করিয়াছেন ও শক্তিব পরিচয় দিযাছেন, অদ্যাপি কোন ব্যক্তি ওরূপ করিতে পাবেন নাই। পাশ্চাত্য লোকদিগের সম্মুখে আপনি হিন্দু-ধর্মের যেরূপ শতগুণ গৌরব বৃদ্ধি করিযাছেন তাহাতে প্রত্যেক হিন্দু, প্রত্যেক সন্ন্যাসী আপনাকে গৌববান্বিত মনে করেন। বেদধর্মের গূঢ় রহস্যগুলি আপনি উপলব্ধি করিযা যেরূপ সুচারু-রূপে এবং সর্বসম্বাদিক্রমে তাহা ব্যাখ্যা করিযাছেন তাহাতে আমরা সন্ন্যাসীমণ্ডলী ও যাবতীয় হিন্দু আপনার নিকট বিশেষ ঋণী আছি।" পলিতকেশ মহাস্থবির অশীতিবর্ষীয মহান্ত মহারাজজী যখন এইরূপ অভিনন্দন ও স্তুতিবাদ আবৃত্তি করিতেছিলেন স্বামিজী তখন লজ্জিত, বিহ্বল ও নিতান্ত উদ্বেলিতচিত্ত হইযা একটি অল্পবয়স্ক শিশুর ন্যায় মৃদুভাবে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আমি কিইবা সামান্য কার্য করিয়াছি, সকলই ঈশ্বরের কৃপা ও ইচ্ছা। তাঁহার

মহিমা তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন। এই দেহ শুধু নিমিত্ত মাত্র। আপনারা বৃদ্ধ সাধু, মহাজ্ঞানী; আপনাদিগের আশীর্বাদ ও কৃপা মস্তকে থাকিলে এরূপ বহু কার্য সম্পন্ন হইতে পারে, আর আপনি ভগবান কেদারনাথের মহান্ত আপনি স্বয়ং শিবাবতার, আমি সামান্য ক্ষুদ্র মনুষ্য।"

মহান্ত মহারাজজী আরও কহিলেন, "আপনি যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন তখন আমাদের প্রধান মঠ হইতে আপনাকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য শিবিকা ও লোকজন প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত জনসংখ্যা বহুল হওয়াতে আপনি শারীরিক ক্লান্ত হইযাছিলেন এবং আমাদের নিমন্ত্রণ তখন কার্যবশতঃ আপনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমাদিগের মঠের সাধু-মহাত্মারা এজন্য বিশেষ দুঃখিত আছেন। তাঁহারা আমার প্রতি তারযোগে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, যেন কাশীর এই মঠেতে আপনাকে বিশেষরূপে সম্বর্ধনা ও অভিবাদন করা হয়। আমাদিগের এই মিনতি, যেন আপনি স্বগোষ্ঠী লইয়া কেদারের মঠে একদিন ভিক্ষা গ্রহণ করেন।"

স্বামিজী বৃদ্ধ মহান্তজীর এরূপ বিনীত অভিনন্দন শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া বালকের ন্যায় মিষ্ট শব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ, আজ্ঞা করিলে বা কোন লোক প্রেরণ করিলেই আমি সানন্দে আপনার মঠে গিয়া ভিক্ষা গ্রহণ

করিতাম, এজন্য আপনার কষ্ট করিয়া এখানে আসা আবশ্যক হইত না; যাহা হউক আপনার আজ্ঞা অবশ্য পালন করিব।"

পরদিন প্রাতে দশটা কি এগারটার সময় স্বামিজী শিবানন্দ স্বামী এবং অপর সকলকে সঙ্গে লইয়া মহান্ত মহারাজের মঠে যাইলেন।

জনৈক সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুক তখন মহান্ত মহারাজের মঠেতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বামিজীকে প্রশ্ন করিলেন, "সকল ধর্মেই কি সিদ্ধ-পুরুষ আছেন?" সকল ধর্মতেই যে সিদ্ধ-পুরুষ আছেন, স্বামিজী এইটি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, "এমন কি বামাচারী তন্ত্রেতেও সিদ্ধ-পুরুষ হন, তবে গুরু মহারাজ বলিতেন যে, পথটা অতি নোংরা। কিন্তু সে পথেতেও সিদ্ধ-পুরুষ হয়।" এরূপ নানাপ্রকার কথাবার্তা হইতে লাগিল এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও স্বামিজীর ভাব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। তাহার পর মহান্ত মহারাজজী নানাবিধ উপকরণ দিয়া স্বামিজী ও তৎসঙ্গীদিগকে সেবা করাইলেন।

অপরাহ্নে মহান্ত মহারাজজী স্বামিজীকে এক প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন এবং তথায় তাঁহার পূর্বতন গুরুপরম্পরা সকলের আলেখ্য দর্শন করাইয়া সকলের নাম ও গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। তৎপরে একখানি গৈরিক বসন আনিয়া স্বামিজীর পরিহিত গৈরিক বসনের উপর পরাইয়া দিলেন এবং গাত্রেও আর একখানি গৈরিক উত্তরীয় জড়াইয়া দিলেন।

মহান্ত মহারাজজী অতীব হর্ষিত হইয়া ভাবোচ্ছ্বাসে কহিতে লাগিলেন, "আজি প্রকৃত দণ্ডীজী ভোজন হুয়া।" তাহার পর সকলে মহান্তজীর অনুরোধে কেদারের মন্দিরেতে চলিলেন। স্বামিজীর সম্মানার্থে কেদারজীর তখনই আরতি হইতে লাগিল। স্বামিজী বাহিরের প্রকোষ্ঠ বা যেখানে নন্দী (বৃষ) আছেন, সেই গৃহের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই একেবারে সমাধিস্থ, বাহ্যজ্ঞানরহিত, নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। অগ্রসর হওয়া বা পদবিক্ষেপ করিবার সামর্থ্য আর রহিল না, যেন "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে"*। পায়ে মোজা ছিল, জলে ভিজিতেছিল, কিন্তু কাহারও সামর্থ্য হইল না যে, মোজা উন্মোচন করিয়া দেয় বা কোন প্রকার শব্দ করে। সকলেই ভাবে তন্ময় ও জ্ঞানমগ্ন, কাহারও কিছু লক্ষ্য করিবার সময় বা সামর্থ্য রহিল না। স্বামিজীর সমাধিস্থ ভাব দেখিয়া সকলের ভিতরকার সুষুপ্ত কুণ্ডলিনী যেন জাগ্রত হইয়া উঠিল। সকলেই তন্ময়, সকলেই ধ্যানমগ্ন—অপূর্ব শোভা! অপূর্ব দৃশ্য!! শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব যে বলিতেন, স্বামিজীর ভিতর শিব বিরাজ করিতে-ছেন এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে তাঁহাকে পৃথ্বীতলে আনয়ন করিয়াছিলেন, আজ সেই ভাব, সেই মহাশক্তি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, সকলেই দেখিতে লাগিলেন, সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন। গর্ভগৃহে শিলাময় কেদার-মূর্তি, তাহাতে দীপদ্বারা আরতি হইতেছে;

* রঘু, ২য় সর্গ, শ্লোক ৩১।

পশ্চাতে সমাধিস্থ মহাযোগী মহাদেব, 'যোগেশ্বর যোগমূর্তি'। উভয়ের অভ্যন্তরস্থিত বস্তু এক, কেবলমাত্র আকারে চেতন ও অচেতন—স্থাবর, জঙ্গম এইমাত্র প্রভেদ। এইরূপ গম্ভীর নিস্তব্ধ ও মনোচ্চগামী ভাব দেখিয়া কেই বা না স্তম্ভিত, বিস্মিত ও সমাধিস্থ হইবে? স্বামিজীর মুখ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। সচরাচর আমরা যে মুখ দেখিতাম ও যে স্বামিজীর কাছে বসিতাম ও আলাপ করিতাম, ইনি যেন সে ব্যক্তি নন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র লোক। ইহাকেই কি বলে, "দেবোভূত্বা দেবংযজেৎ"? মহাসিদ্ধ যোগী, মহাত্মারা সমাধিস্থ ও বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া চিত্ত পরমাত্মাতে লয় করিলে কিরূপ হয় তাহা পূর্বে আমরা কখনও দেখি নাই। কিন্তু স্বামিজীর ভাবাস্তরিত অবস্থা দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিলাম। এই অবস্থাটি বর্ণনা করা কাহারও সাধ্য নয়। কেবল কিঞ্চিৎ এখানে আভাস দিলাম।

এইরূপ অর্ধসুষুপ্ত অবস্থায় আমরা সকলে কেদারের মন্দির হইতে বহির্গত হইলাম। স্বামিজী তখন ভাবাবস্থায় রহিয়াছেন। মৃদু মৃদু পদ-সঞ্চালনে আমরা প্রাঙ্গণদ্বারে আসিলাম এবং স্বামিজীর যাহাতে কোন প্রকার আঘাত না লাগে এইরূপ ভাবে অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল, ক্রমশঃ স্বামিজীরও ভাবরাশি উপশম হইতে লাগিল। একটি ছত্রের সম্মুখ দিয়া যখন গাড়ী যাইতেছিল তখন স্বামিজী বালকের ন্যায় আনন্দ করিয়া

"নাট-কোট-চেটী" দক্ষিণা শব্দের অপভ্রংশ ব্যঙ্গ করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গাড়ী কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

জনৈক ডাক্তার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে প্রায়ই স্বামিজীকে দেখিতে আসিতেন। স্বামিজীও তাঁহার চিকিৎসায় কিছুদিন সুস্থ ছিলেন। ডাক্তার একজন থিওজফিস্ট বা তদনুরাগী। তিনি একদিন আসিয়া থিওজফিক্যাল্ সোসাইটি যে এ দেশে নানারূপ কার্য করিতেছে, সেই বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলেন। মিসেস্ বেসান্ট ও তাঁহার কার্যপ্রণালী যে ভারতের বিশেষ উপকার করিতেছে ও দেশের যে একমাত্র কল্যাণ করিতেছে, সেইটি সমর্থন করিয়া তিনি নানারূপ তর্কযুক্তি আরম্ভ করিলেন। স্বামিজী প্রথমে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন, বিশেষ কোন প্রতিবাদ্ বা প্রত্যুত্তর করিলেন না। ডাক্তার বাবু অপ্রতিহত হইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার বাক্‌চাতুর্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ স্বামিজীব মুখের বর্ণ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। মুখের সাধারণ ভাব দৃঢ় আকার ধারণ কবিল। তেজহীন চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং আকার, ইঙ্গিত ও অবয়বের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু তাহা কিছুই নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাব শ্রোতা যে অপর এক পুরুষ হইতেছেন এবং তিনি যে বিশেষ শক্তিমান পুরুষের সম্মুখে বসিয়া আছেন, তাহাও তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

পূর্বের শ্রোতা যে অন্তর্হিত হইয়া তৎস্থানে এক দিগ্বিজয়ী-পুরুষ রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা ডাক্তারের তখনও বোধগম্য হয় নাই। সহসা ঝটিকার ন্যায় স্বামিজীর মুখ হইতে বাণী নিঃসৃত হইতে লাগিল। গম্ভীর স্তব্ধায়মান, আজ্ঞাপ্রদ স্বর তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি যে জগৎকে তৃণজ্ঞান করেন এবং পদতলে মেদিনীকে নিষ্পেষণ করিতে পারেন, সেই ভাব তাঁহার ফুটিয়া উঠিল। সম্পূর্ণ অপর এক নূতন পুরুষ পূর্বদেহের ভিতর প্রবেশ করিল। তিনি স্তব্ধায়মান শব্দে ডাক্তারকে বলিতে লাগিলেন, "বিদেশীয়েরা এদেশের সব বিষয়ে গুরু হইয়াছে, অবশিষ্ট বাকী আছে এক ধর্ম, তাহাতেও তাহারা হাত দিতে আসিতেছে, আর তোমরা অবনতমস্তকে বিদেশীয়কে গুরুর আসনে বসাইয়া গুরু বলিয়া সম্মান করিতেছ। এই পুণ্য ভারতভূমিতে মহাপুরুষগণ কি একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছেন যে, বিদেশ হইতে গুরু আনাইয়া লইতে হইবে? ইহা কি গৌরবের না হীনতার কথা? আমি এখানে অভিনন্দন দিতে বা কোন প্রকার গোলমাল করিতে সকলকে বারণ করিয়াছি। শরীর অসুস্থ, নিরিবিলি থাকিব; সেই জন্যই চুপচাপ বসে আছি।" ক্রমেই তাঁহার স্বর আরও গম্ভীর হইতে লাগিল, মুখে ওজস্বিতা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আরক্তিম বিস্ফারিত নেত্রে ডাক্তারের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া স্থির, দৃঢ়, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যদি ইচ্ছা করি তাহলে এই রাত্রেই বেসান্ট ও সমগ্র কাশীবাসীরা এই চরণতলে আসিয়া

পড়িবে। অযথা শক্তি ব্যবহার করা উচিত নয় সেজন্য তার কিছুই করি নাই।" ইতিপূর্বে ডাক্তার বাবু কিঞ্চিৎ দ্বিধাভাবে (স্বামিজী যে অপর সকলের চেয়ে অধিক উন্নত নন এই ভাবিয়া) একটু আপ্যায়িত-স্বরে বলিয়াছিলেন, "তাইত মশাই, বেসান্ট আপনার সহিত দেখা করিতে আসিল না।" ডাক্তারের আপ্যায়িত ভাব দেখিয়া স্বামিজী মনে মনে একটু বিরক্ত হইযাছিলেন। এই নিমিত্ত তাহাকে আত্মশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলেন।

ডাক্তার বাবু স্তম্ভিত ও কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন এবং শীঘ্রই বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যাঁহার সহিত কথা কহিতে-ছিলেন, তিনি যখন স্বাভাবিকভাবে থাকেন, সাধারণ লোকের চেয়েও নিম্ন ও হীন হইতে পারেন—বালক বা বুদ্ধিহীনের ন্যায় হইতে পারেন, শক্তিমত্তার কোন বিশেষ পরিচয় দেন না; দেখিলে অতি সাধারণ লোক, এইটি মাত্র বোঝা যায়। কিন্তু যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে নরম, কোমল, স্নেহপূর্ণ মুখ একেবারেই বিপরীত ভাবাপন্ন হয় ও দুষ্প্রেক্ষ্যবদন হইয়া উঠিতে পারেন।

একস্থানে বসিয়া ভাবান্তরবশতঃ স্বামিজীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখভঙ্গি যে বহুবিধ হইত, ইহা তাহারই একটি নিদর্শন দেখিলাম। চিত্রে তাঁহার যে বহুবিধ প্রতিকৃতি আছে, অনেকেরই ধারণা যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার রূপ গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া

যাইবে যে, একই আসনে, একই পরিচ্ছদে তিন চারিখানি ছবি লওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক ছবিটিই যে স্বতন্ত্র, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি ইচ্ছামত মুখের ও শরীরের গঠন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিতে পারিতেন, এইটিই তাঁহার বিশেষ লক্ষণ ছিল।

আমরা হঠাৎ তাঁহার মুখভঙ্গির পরিবর্তন ও দুষ্প্রেক্ষ্যবদন দেখিয়া ত্রস্ত, চমকিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। ইতিপূর্বে যাঁহাকে সাধারণ লোক বলিয়া দেখিতেছিলাম, যিনি সাধারণ লোকের মত নানাবিধ হাসি তামাসা, ঠাট্টা করিতেছিলেন এবং যাঁহার সাধারণের সহিত বিশেষ পার্থক্য ছিল না, হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলাম, "উপর্যুপরি সর্বেষামাদিত্য ইব তেজসা"†। সূর্য যেমন পৃথিবী ও নানা গ্রহের ভিতর তেজঃ দ্বারা আপনার প্রাধান্য সর্বোপরি রাখেন, সেইরূপ সহসা তাঁহার দেহের ভিতর হইতে তেজঃ বাহির হইয়াছিল।

অল্পক্ষণ পরে আমাদের হৃদয়ে হর্ষ ও ভীতি এক সময়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। দেখিতেও অসমর্থ, না দেখিতেও অসমর্থ। অদ্যাপি সেই দৃশ্য মনে করিলে চিত্ত প্রফুল্ল ও আনন্দিত হইয়া উঠে, এবং পুনরায় তাহা দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছা হয় অস্পষ্টভাবে কখন কখন যেন দেখি ও তখন মনে হয় :

"ঐ যেন সেই পাগল আমার,
দেখছি যেন মুখখানি তার"।

---

† মঃ ভাঃ, নলোপাখ্যান, শ্লোক ২।

ডাক্তার বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন এবং কথা পরিবর্তন করিলেন। স্বামিজী তখন পুনরায় পূর্বতন শান্ত সন্ন্যাসী হইয়া রহিলেন, যেন কোন কথাই হয় নাই, পূর্ব বিষয় যেন কেহ কখন শুনে নাই। আমরাও একটু যেন আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু ব্যাপারটা যেন এক স্বপ্নাবস্থায়, এক মুহূর্তের মধ্যে এক প্রলয়কাণ্ড হইয়া গেল। যদিও বর্ণবিন্যাস বা শব্দাদি বিশেষ স্মরণ নাই কিন্তু ভাবভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, দুষ্প্রেক্ষ্যবদন ও আরক্তিম নয়ন—এরূপ এক দৃঢ়চিত্র আমার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছে যে, ইহা জীবনে আর বিস্মৃত হইব না। যখনই সেই বিষয় মনে করি তখনই ধমনীতে আমার শোণিত উষ্ণভাব ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয় ও হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইয়া উঠে। ইহাকেই বলে মর্মস্পর্শী, অশরীরী বাণী।

খ্যাতনামা কেলকার* এই সময় কাশীধামে ছিলেন। একদিন সায়ংকালে তিনি স্বামিজীকে দেখিতে আসিলেন। শরীর অসুস্থ, এইজন্য স্বামিজী পর্যঙ্কের উপর শায়িত ছিলেন। কেলকার বিনীতভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্থিত আস্তরণে উপবেশন করিলেন, এবং গুরু বা মহাপুরুষের নিকট সসম্ভ্রমে যেমন যাওয়ার প্রথা তদ্রূপ নম্র ও বিনয়পূর্ণ-ভাবে করযোড় করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

---

* নরসিংহ চিন্তামন কেলকার, 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক। বেলুড় মঠে স্বামিজীর নিকট লোকমান্য তিলকের আগমন সম্বন্ধে গ্রন্থকারের "শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান" পৃঃ ১৮-২২ দ্রষ্টব্য। সঃ

কথাবার্তা ইংরাজীতে হইতে লাগিল। আমরা দূরে বসিয়াছি। প্রত্যেক শব্দ শুনিতে পাইলাম না এবং বয়স অল্প-বশতঃ বিদেশীয় ভাষার সকল কথা বোধগম্য হইল না। কিন্তু আকার, ইঙ্গিত ও ভাবভঙ্গিতে যাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল তাহাই এস্থলে বিবৃত করিতেছি। স্বামিজী প্রথম শুইয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ক্রমেই ভাবরাশি ঘনীভূত হইতে লাগিল। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। শরীর দুর্বল থাকিলেও তিনি হঠাৎ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং কথাবার্তা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দৃঢ়ভাবে কহিতে লাগিলেন। ক্রমে অধিকতর ভাবরাশি আসিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিল। তিনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইলেন। চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল, ওষ্ঠ কুঞ্চিত, কম্পমান ও দার্ঢ্য-রূপ ধারণ করিল। ললাট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত তবু প্রশস্ত, নাসিকা হ্রস্ব বা অবজ্ঞাব্যঞ্জক লম্বমান ও কুঞ্চন-ভাব ধারণ করিল, মুখ আরক্তিম হইল।

শব্দ ক্রমে মধুর ও শ্লথ অবস্থা হইতে খরতর ও উচ্চভাব ধারণ করিল। ক্রমিক তাঁহার সুষুপ্ত তেজস্বীভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল। রুগ্ন, অসুস্থ ও কাতর ব্যক্তি যিনি শুইয়া-ছিলেন এবং শোকার্ত ও মৃদুভাবে যিনি ইতিপূর্বে বাক্যালাপ করিতেছিলেন, সেই ব্যক্তি, সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সেই সকল ভাব একেবারে বিদূরিত হইয়া গেল এবং তৎস্থানে মহা তেজস্বীভাব, সুস্থ শরীর ও তেজস্বীবাণী আসিয়া প্রকাশ

পাইল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র বর্ণ-উচ্চারণ, স্বতন্ত্র নেত্রের দৃষ্টি। ভাবাবেশে দেহ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে আমরা স্বামিজীকে বহুবার দেখিযাছি, এইজন্য আমাদের নিকট ইহা তত নূতন ও কৌতূহলের বিষয় বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রথম বা দ্বিতীযবারের ভাবাবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তখন চমকিত ও ত্রস্ত হইয়াছেন। কেলকার মহাশয় স্বামিজীকে এরূপ সহসা দেহ পরিবর্তন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ধারণ কবিতে দেখিয়া বিমোহিত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে উন্মনা হইযাছিলেন—তাহা তাঁহার মুখভঙ্গিতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পাবিলাম। স্বামিজীব অন্তর্নিহিত শক্তি যেরূপ ঊর্ধ্ব মাত্রায় উঠিতে লাগিল, কেলকার মহাশয়েরও শক্তি তদ্রূপ ন্যূন হইতে লাগিল। যেন, "প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী"* অর্থাৎ উষাব পূর্বে চন্দ্র যেরূপ হীনজ্যোতি হইযা যায, কেলকার মহাশযও তদ্রূপ হইলেন।

স্বামিজী ক্রমে ধীরে ধীরে ভাবতবর্ষের বিষয় নানা কথা কহিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক, সমাজসংস্কার প্রভৃতি নানা বিষযের কথা হইল। স্বামিজী ক্রমে ব্যথিত, বিমনায়মান, দুঃখিত ও শোকার্ত হইয়া পডিলেন। তাঁহার চক্ষুতে বিষাদ, শোক, দয়া এবং সর্বজীবের প্রতি প্রেম লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি কখন খেদোক্তি করিয়া কখন বা ম্রিয়মাণ-ভাবে কখন বা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন,

* রঘু, ৩য় সর্গ, শ্লোক ২

"ভারতবাসীদের একরূপ হীন অবস্থায়, এরূপ দৈন্য অবস্থায় আর বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিবার কি আবশ্যক? পলকে পলকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, অনাহার, লাঞ্ছনা, ক্লেশ দিবারাত্র অনুভব করিতেছে, কেবল জীবনমাত্র সংরক্ষণ করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে, প্রজ্জ্বলিত নরকানলে দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছে; মৃত্যু ইহার চেয়েও যে, ঢের ভাল ছিল!" তিনি এইভাবে শোকার্ত ও সন্তপ্তহৃদয়ে ভারতবাসীদিগের দুঃখের বিষয় কহিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার সকরুণ দেশপ্রেমিকতা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইলাম। একরূপ অকপট দেশানুরাগ যে হইতে পারে, ইহা আমরা এই প্রথম দেখিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য খেদোক্তি, তাহাদের কষ্ট যেন নিজের কষ্ট; কিসে সকলের উন্নতি হয়, কিসে তাহারা সুখে থাকিতে পারে ও উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন পায়, কিসে তাহাদের দুঃখ তিরোহিত হয়, সেই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় হইতে শোক ও প্রেমের উৎস দ্রুতবেগে উঠিতে লাগিল। একরূপ প্রেমিকতা ও জনহিতৈষিতা আমরা অপর কোন ব্যক্তির নিকট দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ।

তাহার পর তিনি কেলকারের সহিত রাজনৈতিক বিষয় আলাপ করিতে লাগিলেন। শুষ্ক বৈদেশিক রাজনীতিতে এ দেশের কোন উপকার হইবে না, এবং অনুকরণেও কোন ফল হইবে না কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত পূর্বতন প্রথা রাখিয়া চলিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে—এইটি তিনি কেলকারকে

বিশেষভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। স্বামিজী কেলকার মহাশয়কে আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইলেন যে, ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম্মের ভিতর দিযাই নানারকম উন্নতি হইতেছে একমাত্র ভারতবর্ষের পন্থা। কিন্তু ধর্ম্মবিচ্যুত রাজনীতি বা অন্য কোন প্রকার সামাজিক আন্দোলন ভারতবর্ষে কোন কার্যদায়ক হইবে না। এই সমস্ত বাক্য শুনিযা কেলকার মহাশয় সন্তুষ্ট ও হর্ষিত হইয়া বিনীতভাবে প্রণামপূর্বক আশীর্বাদ গ্রহণ কবিয়া চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্যহীন ভ্রমি ধরামাঝে,
উত্তাল তরঙ্গরাশি গ্রাসিছে জগৎ,
হাহাকার সদা উঠে রোল
মর্ম্মভেদী, পশিছে হৃদয মাঝে,
—নাহিক নিস্তার!
কে আছ মানব, নিবার তরঙ্গরাশি।

স্বামিজী যখন উত্তর ভারতবর্ষ হইতে কুমারিকা পর্যন্ত পদব্রজে দীনহীনেব ন্যায় পর্যটন করিতেছিলেন তখন তিনি স্বচক্ষে সমস্ত ভারতবাসীদের দুঃখ কষ্ট দর্শন করিযাছিলেন। আতুর, দরিদ্র ও নিরাশ্রয ঔষধপথ্য ও আহার ব্যতীত নিতান্ত কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে দেখিযা তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। তিনি আমেরিকা যাইয়া এ বিষয বিস্মৃত হন নাই। বহু পত্রে ও বক্তৃতায তিনি এ সকল বিষয় বিশেষ-

ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, সেই পূর্বাবস্থা ও পূর্বভাব বর্তমান রহিয়াছে; ইহা অধিকতর কষ্টকর বলিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার মন দুঃখী, দরিদ্র ও ক্লিষ্টের নিমিত্ত সর্বদা চঞ্চল থাকিত। আনন্দের ভিতর শোক, হর্ষের ভিতর বিষাদ সর্বদাই তাঁহার মুখে পরিলক্ষিত হইত। কি উপায়ে এই দুঃখ-রাশির প্রতিকার করা যাইবে, এই চিন্তায় তিনি মগ্ন হইযা থাকিতেন। শোকে তাঁহার হৃদয় উথলিত হইয়া চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইত।

বহুকাল হইতে মহাপুরুষেরা এই বিষয় চিন্তা করিয়াছেন এবং স্ব স্ব কালোপযোগী প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করিয়াছিলেন। যদিও সকল মহাপুরুষের ভাবরাশির মর্ম একই হইয়া থাকে তথাপি কার্যদক্ষতা, সময়োপযোগীতা ও কার্যপ্রণালী পৃথক্ হয়। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "বহুজনহিতায়, বহুজন-সুখায়" এই ভাব লইয়া ভিক্ষুগণ সর্বত্র বিচরণ করিবেন। সরল ভাষায়, "জীবে দয়া এইমাত্র জানি"। প্রত্যেক জীবকে দয়া করিবে। "পানাতিপাতাবেরমণি শিক্ষাপদম্ সমাদিয়ামি"* প্রাণীবধ হইতে বিরত হইলাম—আমি এই প্রতিজ্ঞা, এই শিক্ষা গ্রহণ করিলাম। ইহাই বুদ্ধদেবের পঞ্চশীলার প্রথম মন্ত্র এবং আর চারিটি শীলাও তদ্রূপ।

এই শান্তিভাব অবলম্বন করিয়া, এই অহিংসাভাব গ্রহণ

* সূত্রপিটক—সূত্রসংগ্রহ।

করিয়া বৌদ্ধধর্ম সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিতর এই মন্ত্রটি প্রথম সোপান। সমস্ত বৌদ্ধ ধর্মের ভাবরাশি, প্রক্রিয়া, উন্নতি, স্থিতি ও ধ্বংস এই মন্ত্রটির উপর নির্ভর করিতেছে। 'অনৃশংস স্বভাব', এইটিই হইল বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র।

ভগবান ঈশা কোন একজন লোককে বলিযাছিলেন, "ঈশ্বরকে মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে আপনার জানিবে"। তাঁহার সময় সমাজেতে ইহাই পর্যাপ্ত হইয়াছিল। আধুনিক খৃষ্টীয মতাবলম্বীরা এই ভাবটি গ্রহণ করুন আর নাই করুন কিন্তু ইহাই ভগবান ঈশার উক্তি এবং এই ভাবটিই জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং নানা উপাখ্যানদ্বারা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্য তাঁহার সময়োপযোগী ভাবরাশি একটি শব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, "জীবে দয়া, নামে রুচি"। জীবকে দয়া করিবে এবং ভগবানের নামে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি রাখিবে। যদিও এই সকল ভাব অতি উচ্চ ও তখন বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল কিন্তু কালক্রমে তন্নিহিত শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। মন্ত্রটি কেবল শব্দমাত্র হইয়াছে, "প্রাণহীন শব্দে পরিণত"।

স্বামিজী মহা শক্তিমান পুরুষ। একদিকে তাঁহার যেমন সিংহ গর্জন, ওজস্বী ভাব ও দুর্দমনীয় বিক্রম,—কোন বাধা বিপদ

কিছুই মানিতেন না, প্রত্যেক অন্তরায়ের মূলোৎপাটন করিয়া নূতন পন্থা স্থাপন করিতেন, অপরদিকে আবার তাঁহার হৃদয় তেমনি কোমল ছিল। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "দোহনকালে দুগ্ধে যে বুদ্‌বুদ উঠে, তাহাও অতি কঠিন, তাহাতেও অঙ্গুলি কাটিয়া যাইতে পারে, ইহাও সম্ভব, কিন্তু রাধিকার যে প্রেমোচ্ছ্বাস, তাহা দুগ্ধ-বুদ্‌বুদ অপেক্ষাও কোমল হইয়া পড়িত।" আর সে ব্যক্তি নয়, আর সে ভাব নয়! শোকার্তের সহিত শোকার্ত হইতেন, ক্লিষ্টের সহিত ক্লিষ্ট হইতেন।

দার্জিলিং অবস্থান কালে একদিন তিনি প্রাতে বায়ু-সেবনার্থে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শরীর সুস্থ। প্রাতে কিঞ্চিৎ জলযোগও করিয়াছেন, এবং হর্ষিত মনে দুই তিনটি লোক সঙ্গে লইয়া গিরি-সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে ধীর পদ-সঞ্চারে বিচরণ করিতেছেন। এমন সময়ে এক ভুটিয়া স্ত্রীলোককে পৃষ্ঠদেশে গুরুভার বহন করিয়া যাইতে দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ তাহার পায়ে হোঁচট লাগাতে পৃষ্ঠস্থিত ভার পড়িয়া গেল এবং তাহার পাঁজরায় আঘাত লাগিল। স্বামিজী দূরে ছিলেন, অনিমেষ নেত্রে তাহা লক্ষ্য করিলেন; আর পদ-বিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। মুখের ভাব স্থির হইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে তিনি কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বড্ড ব্যথা লেগেছে, আর যেতে পারছি না।" পার্শ্বস্থিত বালকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামিজী, কোথায় ব্যথা লেগেছে?" তিনি তাঁহার

পার্শ্বদেশ দেখাইয়া বলিলেন, "এইখানে,—দেখিস নি, ঐ স্ত্রী-লোকটির লেগেছে?" বালকেরা অল্পবয়সবশতঃ কিছুই বুঝিতে পারিল না, ভাবিল এ আবার কি ঢং—এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে আর এক গাঁয়ে মাথাব্যথা। স্বামিজীর মুখের ভাব এত পরিবর্তিত হইল যে, কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসে গমন করিল। বহুকাল পরে যখন সেই বালকেরা বয়স্ক হইল এবং প্রবীণতা লাভ করিল তখন তাহারা এই ব্যাপারটির ভাব বুঝিতে পারিল।

মহাপুরুষের একটি প্রধান লক্ষণ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে,—A great man is one who can transfigure himself into various forms. মহাপুরুষেরাই কেবল আগন্তুক ব্যক্তির চিন্তানুযায়ী নিজের দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারেন। ইংরাজীতে যাহাকে sympathy বা সহানুভূতি বলে ইহা তাহা নহে, সম্পূর্ণ পরিবর্তনীয় ভাব। আগন্তুক ব্যক্তি শোকার্ত, ক্লিষ্ট, পণ্ডিত, জ্ঞানী বা অপর কোন ভাবাপন্ন হইলে মহাপুরুষেরাও আপনার ভিতর হইতে তদ্রূপিণী শক্তি বিকাশ করিয়া আগন্তুক ব্যক্তির অনুরূপ হ'ন; এবং অনতিবিলম্বে আগন্তুক ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেন যে, ইহার পশ্চাতে বহু উচ্চ স্থান আছে এবং এই পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। সাধারণ লোক ভাবরাশির কেবলমাত্র বর্ণবিন্যাস জানে। কিন্তু মহাপুরুষেরা—সেই

ভাবের যে প্রত্যক্ষ রূপ আছে, অবয়ব আছে, অধিষ্ঠান বা ভঙ্গি আছে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দেন। তাঁহাদের দেহের ভিতর সেই ভাবটি প্রতিবিম্বিত হয়। পূর্বতন ব্যক্তি তিরোহিত হইয়া নূতন ব্যক্তি উদ্ভূত হয় এবং ভাবটি প্রত্যক্ষ হইয়া দর্শকের সম্মুখে প্রতীয়মান হয়। মহাপুরুষ যেন গম্ভীরভাবে বলেন, "দেহ, মন এবং ভাব সবই এক। পরস্পর সকলই ব্রহ্মে যাইবার সোপান।" এই নিমিত্ত স্বামিজী বলিয়াছেন, "দেখে নিজ রূপ, দেখিলে পরের মুখ"।

অপর একটি উক্তি আছে—A great man is the outcome of revolution, fulfils the revolution and is the father of future ages. মহা বিপ্লব হইতেই মহাপুরুষের অভ্যুত্থান। বিপ্লবকেই তিনি পূর্ণমাত্রায় লইয়া যান এবং ভবিষ্য যুগের পথ-প্রদর্শক হইয়া থাকেন। পূর্বযুগের ভাব, আচার ও পদ্ধতি যতদূর রাখা আবশ্যক মহাপুরুষেরা তাহাই রাখেন এবং যতটা বর্তমান যুগে অপ্রয়োজনীয় বা অন্তরায়রূপে লক্ষিত হয় কেবলমাত্র সেই অংশটুকুই পরিবর্তিত করিয়া পতিত্যক্ত অংশ নিজের ভাবরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। ইহা হইতেই পরবর্তী কাল, স্রোতস্বতীর ন্যায় মৃদুগতি হইতে হিল্লোলকল্লোলে পরিণত হয়, পরিশেষে মহাশব্দায়মান মহাসমুদ্ররূপ ধারণ করে। এইটি পণ্ডিতদিগের মধ্যে মহাপুরুষের অপর একটি লক্ষণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দজীর ভিতর এই দুইটি লক্ষণ

একীভূত ও সহজরূপে প্রতীয়মান হয়। কোন্ ভাবটির কখন প্রাধান্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কখন বা প্রথম লক্ষণটি ঘনীভূত হইতেছে, কখনও বা উহা যখন ভাবমুখী হয় ও ওজস্বীভাব ধারণ করে তখন দ্বিতীয় ভাবটি প্রকাশ পাইতেছে এরূপ বলা যায়।

স্বামিজী এই যুগের পথ-প্রদর্শকরূপ এই নূতন মতটি সৃষ্টি করিলেন, "নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা"। "দরিদ্র নারায়ণ"—বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" স্বামিজী যে কয়েকটি উচ্চ ভাব জগৎকে দিয়াছেন তাহার মধ্যে এইটি অন্যতম, হয়ত এইটি নূতন। 'জীবে দয়া' তিনি পছন্দ করিতেন না। দয়া শব্দ উচ্চ-নীচ ভাব আনয়ন করে এবং আশ্রিত ও করুণাপ্রার্থী এরূপ ভাব পায়। স্বামিজী নূতন ভাব প্রকাশ করিলেন, দীনহীনকে শিব জ্ঞানে পূজা করা। ইহাতেই জগতের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "হাতী নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ, চোর নারায়ণ।" স্বামিজী সেই ভাবটি স্পষ্ট করিয়া সাধারণের উপযোগী করিলেন। দরিদ্র নারায়ণের পূজা, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, বাণিজ্যব্যবসা-সংস্কার ও জাতির ভিতর পরস্পর সখ্যভাব স্থাপন করা—এইরূপ বহুপ্রকার সংস্কারের ভাব লইয়া নানা ব্যক্তি চিন্তা করিতেছেন। কার্য ও সমস্ত ভাবগুলিই সত্য এবং খণ্ড খণ্ড রূপে প্রত্যেকটি ফলদায়ক। স্বামিজী কিন্তু একটি শব্দদ্বারা সব ভাবগুলিই

কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। যত প্রকার সংস্কার আছে—সেবা ভাব বা শিব জ্ঞানে জীবসেবা, সকলই ইহার ভিতর আসিয়া যায়, ছুতমার্গ তিরোহিত হয়, সংকীর্ণতা বিদূরিত হয়। প্রাণ উদার হইলে, সকলের ভিতর সেই এক ব্রহ্ম দেখিলে, সকলের ভিতর এক শিব দেখিলে, কেইবা না প্রাণ খুলিয়া পূজা করিবে?

এই সেবা ভাব হইতে ব্রহ্মজ্ঞান আসিয়া যায়। শিবের সেবা, নারায়ণের সেবা যে অহোরাত্র করিতেছে, সকল জীবের ভিতর যে এক শিব, এক নারায়ণ দেখিতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান তাহার করতল-আমলকবৎ। তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায় এবং সাধনের উচ্চাঙ্গসকল প্রতিফলিত হয়।

পূর্বকালে ইষ্ট আর পূর্ত দুইটি শব্দের প্রচলন ছিল। ইষ্ট অর্থে ঈশ্বরলাভার্থ প্রয়াস—বেদপাঠ, হোম, যজ্ঞাদি আর পূর্ত অর্থে পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষাদি রোপণ, পান্থশালা স্থাপন ইত্যাদি। আধুনিক ভাষায় ধর্ম ও কর্ম। স্বামিজী এই ভাবটি পরিবর্তন করিয়া নূতন ভাব সৃষ্টি করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন—ইষ্টই পূর্ত এবং পূর্তই ইষ্ট। ধর্মই কর্ম এবং কর্মই ধর্ম। কর্মেতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এবং কর্মেতেই মুক্তি। তিনি বহুবার বলিয়াছেন যে, ভারতে ধর্ম আছে, ভারতে ভক্তি আছে কিন্তু প্রাণহীন। ইহাতে প্রাণ সঞ্চার করা আবশ্যক। কর্মের ভিতর দিয়া ধর্মকে দেখান চাই। প্রত্যেক কর্মই ধর্ম। প্রত্যেক সেবাই নারায়ণ সেবা, এই বীজমন্ত্র তিনি প্রণয়ন করিলেন।

এস্থানে একটি উপাখ্যান বলিলে অসংগত হইবে না।

জনৈক মহাপুরুষ এক সময় প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন এমন সময়ে এক পোষা টিয়া পাখী উড়িয়া আসিয়া সেই মহাপুরুষের মস্তকে এবং স্কন্ধে বিচরণ করিতে লাগিল। মুহূর্ত মধ্যে আবার সে উড়িয়া বৃক্ষে বসিল। আবার মহাপুরুষের স্কন্ধে আসিয়া বসিল। এইরূপে সেই পক্ষী নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিল। সেই মহাত্মা তাহার ঐ ক্রিয়া দেখিয়া চক্ষু স্থির, নিমীলিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন—যেন কি ভাবিতেছেন। অনেক পরিমাণে বাহ্যজ্ঞান হ্রাস হইয়াছে। মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ, যেন কোন নূতন বস্তু দেখিতেছেন ও উপলব্ধি করিতেছেন। সহসা তিনি জনৈকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, টিয়া পাখীকে খাওয়ান, গরুর জাব কাটা, গোয়ালঘর পরিষ্কার করা, কুটনো কোটা, বাসন মাজা, ঠাকুর-ঘরের মেঝে পোঁছা, ঠাকুর পূজা করা আর জপধ্যান করা সবই দেখছি ভাই এক। সব এক—এক! এক!! এক!!! কোনটা বড়, কোনটা ছোট নয়। তাই আমি অবাক হয়ে এখানে বৃষ্টির মাঝে অরগায়ে বসে আছি। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কি দেখছি আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।" ইহাকেই বলে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান সবই এক। ইহাকেই বলে কর্ম থেকে ব্রহ্ম দর্শন।

এই তেজস্বী মহাভাবের কাছে অপর সকল ভাব হীনপ্রভ হইয়া যায়। প্রাণের ভিতর ব্রহ্মশক্তি জাগরিত হইলে, হৃদয়ের কবাট উদ্ঘাটিত হইয়া প্রাণ যেন সকল জীবের প্রতি তরঙ্গায়মান

হইয়া প্রবাহিত হয়। এই নিমিত্ত স্বামিজী বারংবার বলিতেন, "প্রেম, প্রেম এই মাত্র জানি"। যে প্রাণ থেকে ভালবাসিতে জানে, নিঃস্বার্থ হইয়া অপরকে সেবা করিতে ও ভালবাসিতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞান ত তার অচিরাৎ হইবে।

লীলা দেখিলে, লীলা অনুভব করিলে নিত্য স্বতঃসিদ্ধ তাহার উপলব্ধি লয়। নিত্যের জন্য আর কোন প্রয়াস করিতে হয় না। এই সেবাভাব সকল মানুষকে এক করিতে পারে। বর্ণাশ্রমের ক্ষুদ্র পরিধির বহু উচ্চে, রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কের বহু উচ্চে, সমাজ-সংস্কার আপনা আপনি হইয়া যায়। এইজন্য স্বামিজী পুনঃপুনঃ বলিতেন, "সেবাধর্মই এ যুগের প্রধান সহায়।" দেশের জড়তা নাশ করিতে গেলে, সঞ্জীবতা আনিতে গেলে, দেবভাব জাগ্রত করিতে হইলে সেবাধর্মই প্রধান সহায়ক।

লক্ষ্যহীন ভ্রমি ধরামাঝে,
উত্তাল তরঙ্গরাশি গ্রাসিছে জগৎ,

*　　　*　　　*

কে আছ মানব, নিবার তরঙ্গরাশি।

স্বামিজী ভারতের যুবকদিগকে আহ্বান করিয়া, অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া যেন বলিতেছেন,—কে আছ মানব, নিবার তরঙ্গ-রাশি!

ভাবপ্রবণ হওয়া, বহুভাষী হওয়া এবং নিরর্থক তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করা এতদ্ জাতির প্রধান দুর্বলতা। কার্যকারিতা, সংঘটন-শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। সেবাকার্য

করিতে যাইলে কার্যতৎপরতা ও সংঘটন-শক্তি পরিবর্ধিত হয়। এই সংঘটন-শক্তিই জাতিগঠন করিয়া থাকে, এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম উদ্ভূত করিয়া দেয়। দেবভাব উদ্ভূত না হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব আসে না এবং জাতির জাতীয়ত্ব হয় না। দেবভাব অপরকে দেখাইতে গেলে শক্তি প্রকাশমুখিন্ করিতে হয়, ক্রিয়া তাহার প্রধান অবলম্বনীয় এবং সেবা ভিন্ন ক্রিয়া হওয়া সুকঠিন। এইজন্য স্বামিজী কেবলই বলিতেন,—জীবসেবা এই যুগের প্রধান সহায়। নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দিবে, শোকার্তদিগকে সান্ত্বনা দিবে; এবং সুষুপ্ত দেবভাব তাহাদিগের ভিতর জাগ্রত করিয়া দিবে। ইহাই হইতেছে দেশের কল্যাণকর পন্থা! ভগবান ঈশাও বলিয়াছিলেন,—যিনি সকলের সেবক (minister) তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন। স্বামিজী নানাস্থানে এই বাণী পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন,—আমি ব্রহ্মতে লীন,—ব্রহ্ম আমাতে লীন হও। কর্মই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কর্ম। কর্ম দ্বারাই ব্রহ্ম পাওয়া যায়।

স্বামিজী কাশীধামে আসিবার তিন বৎসর পূর্বে চারু বাবু প্রমুখ আমরা একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলাম। ঠাকুর ও স্বামিজীর গ্রন্থাদি পাঠ, তদ্বিষয় আলোচনা ও কর্মযোগের উপর বিশেষ মন রাখিয়া কিরূপে কার্য চালাইতে পারা যায় এ বিষয়ে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতাম। আমরা কয়েকটি যুবক মিলিত হইয়া ধ্যান, ভজন, সৎচেষ্টা, সৎপ্রসঙ্গ এবং সেবা

করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। ক্রমে কাশীর ভদ্রমহোদয়গণ আমাদের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। কাজটি অল্পে অল্পে বাড়িতে লাগিল। আমরা ইহার নাম রাখিয়াছিলাম, "দরিদ্র প্রতিকার সমিতি"।

দুই বৎসর কাল স্বামিজীর ভাব লইয়া আমরা কার্যারম্ভ করি এবং তৃতীয় বৎসরে স্বামিজীর ভাব বিশেষতঃ কর্মযোগের ভাব কি করিয়া কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা "দরিদ্র নারায়ণ সেবা-সমিতি" প্রতিষ্ঠা করিলাম, এবং অল্পে অল্পে কার্যও আরম্ভ হইল। সমিতির কার্যারম্ভের এক বৎসর পরে স্বামিজী কাশীধামে আগমন করেন এবং আমাদিগকে তাঁহার পদানুগ বলিয়া গ্রহণ করেন।

স্বামিজী এই সময়ে চারু বাবুর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া জীবসেবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ উপদেশ দেন। স্বামিজী ভূয়োভূয়ঃ বলেন,—"গরীবের একটি পয়সা নিজের গায়ের রক্ত বলে জানবি; আর তোরা কি দরিদ্র প্রতিকার সমিতি করবি? False coloursএ march করিস না। এর নাম ঠাকুরের নামে Ramkrishna Home of Service রাখ। Mission-এর হাতে এটিকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দে।" আমরাও সেই সময়ে তদনুযায়ী কর্ম করিয়াছিলাম।

এইরূপে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামিজী কৃপা করিয়া চারু বাবু ও আমাদের কয়েকটির ভিতর যে শক্তি সঞ্চার

করিয়াছিলেন, সেই শক্তি পরিবর্ধিত হইয়া বর্তমানে বিশাল রূপ ধারণ করিয়াছে এবং আরও যে কত বড় হইবে তার কোন ইয়ত্তা নাই। অনেক সময় সেবাশ্রম ও তাহার কার্য-প্রণালী দেখিয়া আমি নিভৃতে একস্থানে স্তম্ভিত হইয়া চিন্তা করি। আমি পূর্বে স্বামিজীর দেহ-রূপ দেখিয়াছি, সেই চেহারা, সেই মূর্তি, সেই অবয়ব আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু এ নব অবয়ব ত কখন দেখি নাই। গৃহ, উদ্যান, চিকিৎসালয়, রোগীগণ; ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীগণ ত্বরিতপদে রোগীদিগের নিকট ঔষধ ও পথ্য লইয়া গতায়াত করিতেছেন,—সবটাই ত স্বামিজীর আর এক রূপ। কোন্‌টা যে স্বামিজীর আসল রূপ তাহা বুঝিতে পারি না। অস্থিমাংসের ভিতর যে স্বামিজী ছিলেন তাহার পরিধি অল্প ছিল, কিন্তু অস্থিমাংসবিহীন স্বামিজী বিশাল, মহান্; তাহার আমি কিছু সীমা করিতে পারি না। তাই নির্বাক স্তম্ভিত হইয়া বিরলে বসিয়া থাকি—"অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার"। স্বামিজীর দেহ হইতে চিন্তারাশি, ভাবরাশি এখন এই গৃহাদি, রোগী, ঔষধ, পথ্য এবং সেবক ও সেব্যরূপে পরিণত হইয়াছে,—"সূক্ষ্ম, স্থূলপ্রসবিনী, স্থূল পুনঃ সূক্ষ্মেতে মিলায়।" ব্রহ্মই কর্ম এবং কর্মই ব্রহ্ম।

জনৈক বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত জমিদার কাশীধামে আসিয়া বাস করেন। তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, জীবনের শেষাংশ অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও

যাইবেন না। সংস্কৃত, দর্শনশাস্ত্রাদি ও শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এবং সাধনমার্গেও খুব উন্নত হইয়াছিলেন। তিনি বিভবশালী ব্যক্তি ও পণ্ডিত, তিনি অপর সাধারণকে দান করিতেন কিন্তু নিজে কখনও প্রতিগ্রহ করিতেন না। তাঁহার মন উদার এবং দয়ার ভাবও বেশ ছিল।

প্রথম হইতে তাঁহার সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। "দরিদ্র প্রতিকার সমিতি" গঠন হওয়া অবধি তিনি ইহার একজন সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া এই সমিতির পর্য-বেক্ষণ ও আর্থিক সাহায্য করিতেন। পণ্ডিত শিবানন্দ যদিও পূর্বকালীন প্রথানুযায়ী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেবাকার্য বা আর্তের যাহাতে কোন প্রকার উপকার হয় সেই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি বা অনুমোদন ছিল।

"রামকৃষ্ণ পুঁথি" পাঠ করিয়া পণ্ডিত শিবানন্দ মহাশয়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ জন্মায়। স্বয়ং সাধক, এইজন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনপ্রণালী ও কঠোর তপস্যা তাঁহার হৃদয়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পণ্ডিতজী শক্তি-উপাসক ছিলেন এবং ভক্তিমার্গের লোক এই জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি উপাসনা তাঁহার এত প্রীতিকর হইয়াছিল। উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি পাঠ করিতেন এবং জ্ঞানমার্গের বিষয়ও জানিতেন, কিন্তু ভক্তির ভাবটি তাঁহার ভিতর প্রধান অঙ্গ ছিল।

পণ্ডিত শিবানন্দ ইংরাজী জানিতেন না। তিনি স্বামিজীর ইংরাজী গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ ভাব গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতেই তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি নানা শাস্ত্র ও বিষয় আলোচনা করিয়া স্বামিজীর মত সমর্থন করিতেন।

"আমি আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি শুনেছি তোমারি গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী।"

(রবীন্দ্রনাথ)

এইরূপে স্বামিজীর প্রতি তাঁহার অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধাভক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

পণ্ডিতজী প্রেমিক-ভক্ত। তাঁহার মন যেন বলিতে লাগিল, "প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অবিমুক্ত ক্ষেত্রের বাহিরে যাইব না; স্বামিজী কলিকাতায় থাকেন, তিনি কি একবার কাশীধামে আসিবেন না?"

"আমি তারে চোখের দেখা
দেখে আসি,
আমি ত অবলা নারী
না পারি যাইতে,
সে কি কভু একবার
পারে না আসিতে?

সই! সই! কারে কই,
তারে আমি ভালবাসি,
আমি তারে চোখের দেখা
দেখে আসি।”

স্বামিজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কাশীধামে আগমন করিলে পণ্ডিত শিবানন্দজী কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানে ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। স্বামিজীকে দেখিয়া পণ্ডিত শিবানন্দের প্রাণ যেন উথলিত হইয়া উঠিল।

পণ্ডিত শিবানন্দ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাটীতে যাইতেন এবং তিনি স্বামিজীর সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিলেন। কখনও বা তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগের কথা, কঠোর সাধনার কথা, গভীর সমাধির কথা, ইত্যাদি নানা বিষয়ের কথা হইত। ভাবরাশি যেন স্বামিজীর দেহে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় স্বামিজী মুখে যে ভাবগুলি বর্ণনা করিতেছেন, অনতিবিলম্বে সেই ভাবগুলি স্বামিজীর দেহে প্রস্ফুটিত ও প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। একই দুই! দুইই এক!! পণ্ডিত শিবানন্দের ভাব ও শ্রদ্ধা আরও দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন নাই কিন্তু পক্ষান্তরে স্বামিজীর দেহের উপরেই তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

কখনও বা পণ্ডিত শিবানন্দের সহিত স্বামিজীর শাস্ত্রাদি আলোচনা হইতেছে। কখনও বা কর্ম ও সেবাই যে এক্ষণে

দেশের একমাত্র কল্যাণকর, এই বিষয়টি তিনি হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন। এরূপ ওজস্বীভাবে তাঁহাকে বুঝাইতেছেন যেন ভাবগুলি তাঁহার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে এবং তাঁহার দ্বারা কাশীস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এই ভাবটি প্রচলিত ও সন্নিবেশিত হয়। পণ্ডিতজী স্বামিজীর সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিয়াছিলেন, সময় সময় নানা প্রকার কৌতুকরহস্য ও আমোদ-আহ্লাদ করিতেছেন; কোন প্রকার সংকোচভাব তাঁহার নাই। পণ্ডিতজী যেন বলিতেছেন,—

"মনের মানুষ হয় যে জনা,
নয়নে তারে যায় গো জানা,
তারা দু'একজনা,
তারা রসে ভাসে রসে ডোবে,
রসে করে আনাগোনা;
কালার কথা কইব কি সই
কইতে মানা।"

পণ্ডিত শিবানন্দ সংস্কৃত ভাষায় স্বামিজীর নামে একটি অভিনন্দন রচনা করিয়া কলিকাতা হইতে মুদ্রিত করিয়া আনয়ন করেন। কিন্তু মনের আবেগে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন, অভিনন্দন পত্রখানি লইয়া যাইতে বিস্মৃত হইতেন। একদিন তিনি অভিনন্দন পত্রখানি লইয়া স্বামিজীর আবাসে যাইতেছেন, আমি ও চারু বাবু তাঁহার শকটের এক পার্শ্বে বসিলাম; সকলেই স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাইতেছি।

পণ্ডিতজীকে আমরা প্রশ্ন করিলাম, "পণ্ডিতমশাই, আপনি স্বামিজীকে কি বলিয়া মনে করেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "স্বামিজীকে আমি প্রকৃত যোগী বলিয়া মনে করি; সেইজন্য আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। তিনি যে বক্তৃতাদির দ্বারা ধর্ম প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার শক্তির সামান্য প্রকাশ মাত্র—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। তাঁহার সঞ্চিত শক্তি তাঁহাতে নিহিত রহিয়াছে বিকাশ দিয়া তাঁহাকে বুঝিতে যাওয়া অসম্ভব; ব্যক্ত অংশ অল্পই হইয়াছে, অব্যক্ত বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। কি মহান্ পুরুষ তিনি! তাঁহার কূল কিনারা কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না।"

পণ্ডিত শিবানন্দ সোৎসাহে হর্ষান্বিত হইয়া এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে আমাদিগের ভিতর হর্ষ ও আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল আমরা কিছু ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। স্থির হইয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত অমৃতবাণী শ্রবণ করিতে লাগিলাম এবং আনন্দের আধিক্য হওয়ায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিলাম। আমাদের আর বাক্-উচ্চারণের ক্ষমতা রহিল না। আমরা তিনজনে যে গাড়ীতে বসিয়াছিলাম সেই শকট স্বামিজীর আবাস অভিমুখে গমন করিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখি স্বামিজী, মহাপুরুষ (স্বামী শিবানন্দ), স্বামী গোবিন্দানন্দ (জনৈক সাধু) ভিঙ্গার রাজার বাগানবাটীর কি এক গাড়ী করিয়া যাইতেছেন। পণ্ডিতজী স্বামিজীকে পথে পাইয়া অতি আনন্দিত হইলেন এবং উভয়েই যান সংরোধ করাইলেন।

পণ্ডিতজী ব্যস্তসমস্ত হইয়া অভিনন্দন পত্রখানি স্বামিজীর হস্তে উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন। স্বামিজী লিখিত শ্লোক-গুলিতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লইলেন এবং বিনীত ও নম্রভাবে কহিলেন, "পণ্ডিতমহাশয়, এ কি করিয়াছেন। আমি সামান্য ব্যক্তি, এরূপ উচ্চ ও বহুল প্রশংসা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। সকলই তাঁর ইচ্ছায় হইয়াছে। তিনি জীবকে যা করান তাই হয়।" স্বামিজী কথাগুলি এরূপ বিনয়, নম্র ও ভক্তিপূর্ণভাবে কহিলেন যে, পণ্ডিতমহাশয় তৎশ্রবণে আরও আকৃষ্ট ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। প্রতিষ্ঠা, যশ, মান যে স্বামিজীর চিত্তকে স্পর্শ বা চঞ্চল করিতে পারে নাই, ইহাই পণ্ডিতমহাশয় প্রত্যক্ষ করিলেন। "প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা" এই উক্তিটি পণ্ডিতমহাশয় আজ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন। তাহার পর শকটদ্বয় আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

পণ্ডিতমহাশয় যদিও অভিনন্দন পত্রখানি অর্পণকালে মুখে কিছু কথা বলিলেন না কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে যেন একটি শ্লোক বাহির হইতে লাগিল, "তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ"। তদবধি পণ্ডিতমহাশয় স্বামিজীর গুণে এরূপ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে, কাশীর বিদ্বৎসমাজে এবং প্রধান প্রধান অধ্যাপকের নিকট এবং মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকটেও স্বামিজীর গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনি শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন

যে, এরূপ যোগৈশ্বর্য সাধারণ জীবে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র স্বয়ং শঙ্করেই এরূপ বিভূতি থাকা সম্ভব এবং স্বামিজী স্বয়ং শঙ্করাবতার। ক্রমে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট পণ্ডিত শিবানন্দ মহাশয় তর্কযুক্তিতে এবং স্বামিজীর জীবনী হইতে ঘটনা নিদর্শন করাইয়া পণ্ডিতসমাজে স্বামিজীকে মহাযোগী ও শঙ্করাবতার, ইহা প্রতিপন্ন ও সকলকে অনুমোদন করাইতে লাগিলেন। পণ্ডিতমহাশয় প্রাচীনতম অধ্যাপক, শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁহার সবিশেষ ছিল, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সাধক ও উদারচেতা ছিলেন, কিন্তু স্বামিজীর প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলন যে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যভাব স্থাপিত হইয়াছিল। পণ্ডিত-মহাশয় কাশীধাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন না এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজীকে দেখিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, সেইজন্য তিনি বলিতেন যে, স্বামিজী কৃপা করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছিলেন।

আর একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া রামাপুরার সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আমাকে কহিলেন, "দেখ, গতকল্য রাত্রে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে," এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি নীরব রহিলেন। আমি ঘটনাটি জানিতে কৌতূহলী হইয়া পুনঃপুনঃ অনুরোধ করায় তিনি অবশেষে বলিতে লাগিলেন এবং আমাকে আদেশ করিলেন যে, "একথা কাহাকেও বলিবে না, ইহা অতি গোপনে রাখিবে।"

কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় এখন গতাসু হইয়াছেন এবং স্বামিজীর দেহও এখন তিরোহিত হইয়াছে এজন্য এসকল কথা এখন ব্যক্ত করিলে কোন দোষ হইবে না এবং আদেশও লঙ্ঘন হইবে না, এই নিমিত্ত এ ঘটনাটি নিম্নে বিবৃত করা হইল।

পণ্ডিতমহাশয় ভক্তিগদগদচিত্তে পূর্ব রাত্রের ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিলেন। "পড়াশুনা করিয়া, জ্ঞান ও ভক্তি যে চরমে একই স্থানে লইয়া যায় ইহার বিষয় আমার সন্দেহ ছিল। কল্য রাত্রিতে স্বামিজী মহারাজের কৃপায় স্বপ্নে তাহার মীমাংসা হইযাছে। গতরাত্রে যখন আমি মায়ের ধ্যানে বসিলাম তখন মায়ের মূর্তির স্থানে কেবল স্বামিজীর মূর্তি আসিতে লাগিল। আমি বারংবার সেটিকে সরাইয়া আবার মাতৃমূর্তি ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহা পারিলাম না। তখন তন্দ্রা আসিল ও অর্ধ-নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। তারপর দেখিলাম যেন আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়া স্বামিজী মহারাজ কাশীর যে স্থানে আছেন সেই স্থানে উপনীত হইলাম। তথায দেখিলাম যেন স্বামিজী মহারাজ এক পর্যঙ্কের উপর শুইয়া আছেন এবং তাঁহাকে বেড়িয়া নিম্নে কতকগুলি সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলী বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও দেখিলাম। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে গিয়া বসিলাম এবং সকলেই যেন ধ্যানস্থ হইলাম। তাহার কিছুক্ষণ পরে স্বামিজীর কৃপায় যেন জ্ঞান-ভূমি হইতে পুনরায় নামিয়া আসিয়া সংকীর্তন করিতে আরম্ভ করিলাম এবং স্বামিজীও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

আমরা সকলে তাঁহাকে বেড়িয়া মহানন্দে নৃত্য ও সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। এরূপ করিতে করিতে আমার মন ভক্তি-ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বুঝিলাম জ্ঞান ও ভক্তির চরম লক্ষ্যস্থল এক—জ্ঞান ভক্তি দুইই এক স্থলে লইয়া যায়; আমার সকল সন্দেহ চিরজীবনের জন্য ঘুচিয়া গেল।" তদবধি পণ্ডিতমহাশয়ের আমাদের প্রতি স্নেহ অধিকতর বর্ধিত হইল, এবং সর্বদাই আমাদিগকে ভোজন করাইতে ও স্বামিজীর বিষয় চর্চা করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন।

ভিঙ্গার রাজা লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের একজন বিশেষ বিভবশালী জমিদার ব্যক্তি। তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, জীবনের শেষাংশ তিনি কাশীধামে অতিবাহিত করিবেন। পুণ্যক্ষেত্র কাশীধাম ছাড়িয়া এমন কি নিজের উদ্যানগৃহের বহির্দেশ পর্যন্ত গমন করিবেন না। নিজেব উদ্যানবাটীতে থাকিয়া সাধনভজন করিয়া দেহপাত করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কাশীর দুর্গাবাটীর সন্নিকটস্থ ভিঙ্গা-ভবনে বাস করিতে-লাগিলেন। তিনি সাধক ও একপ্রকার সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বামিজী কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তিনি সোৎসুক হইলেন, এবং স্বামী গোবিন্দানন্দের সহিত নানাপ্রকার ফলমূল ইত্যাদি ভক্ষ্যবস্তু স্বামিজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বামী শিবানন্দজী তথায় উপস্থিত ছিলেন। গোবিন্দানন্দজী আসিয়া স্বামিজী ও

শিবানন্দজীকে 'নমো নারায়ণ' করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। গোবিন্দানন্দজী ভিঙ্গার রাজার বিষয় কহিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বামিজীকে নিবেদন করিলেন যে, "ভিঙ্গার রাজা আপনার দর্শন পাইতে নিতান্ত ইচ্ছুক। কখন দর্শন হইবে জানিতে পারিলে তিনি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও আপনার সমীপে আসিতে প্রস্তুত।" স্বামিজী তৎশ্রবণে শঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "সে কি! এরূপ করা উচিত নয়। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা অবিধেয়। আমি স্বয়ংই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইব, রাজাজীর এখানে আগমন করিবার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই।"

তৎপরদিবস বা তাহার একদিন পরেই হউক, স্বামী গোবিন্দানন্দজী আসিয়া স্বামিজী ও মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর সমভিব্যাহারে উদ্যানভবনে গমন করিলেন। বাক্যালাপ যাহা হইয়াছিল তাহার মর্মার্থ এখানে সন্নিবেশিত করা হইল। রাজাজী কহিলেন, "বুদ্ধ, শঙ্কর যে শ্রেণীর, স্বামিজী আপনিও তৎশ্রেণীর।" এইরূপ গভীর ভক্তি ও সম্মানসূচকভাবে স্বামিজীর সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, এবং শাস্ত্রাদি ও কার্যপ্রণালীরও উল্লেখ করিতে লাগিলেন। কারণ রাজাজী পূর্বাবস্থায় একজন বিশেষ কর্মী ছিলেন। এই নিমিত্ত ধর্ম ও সাধনার সহিত কর্মের ভাবও তাঁহার বেশ ছিল। তিনি স্বামিজীকে অনুনয় করিলেন যে, কাশীধামেতে তিনি যেন সেবাকার্য ও অন্য প্রকার কার্য প্রণয়ন করেন। তাহাতে

জনসাধারণের বিশেষ কল্যাণ হইবে। অর্থব্যয় বিষয়ে তিনি স্বয়ংই ভার গ্রহণ করিবেন। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ ছিল, এই নিমিত্ত কর্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন না। কেবলমাত্র কহিলেন —এখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবেন, তাহার পর শরীর সুস্থ হইলে কর্মের প্রতি মনোযোগ করিবেন। এইরূপ নানা-প্রকার বাক্যালাপের পর স্বামিজী ও মহাপুরুষজী নিজ ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পরদিবস ভিঙ্গাব রাজার এক কর্মচারী আসিয়া স্বামিজীকে একখানি বদ্ধপত্র দিলেন, তাহা উন্মুক্ত করিলে ৫০০৲ শত টাকার একখানি চেক স্বামিজীর আতিথ্য-স্বরূপ লক্ষিত হইল এবং তৎ অন্তঃস্থিত পত্রেও তদ্রূপ উল্লেখ ছিল। স্বামিজী সন্নিকটস্থিত শিবানন্দজীকে উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "মহাপুরুষ, আপনি এই টাকা লইয়া কাশীতে ঠাকুরের মঠ স্থাপন করুন।" এই অর্থ লইয়া মহাপুরুষজী একটি উদ্যান ভাড়া করিয়া "রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম" স্থাপন করেন এবং পরে সেই উদ্যান ক্রয় করিয়া বর্তমানে স্থায়ী মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

একদিন অপরাহ্ণ বেলা ৫ ঘটিকার সময় কালিদাস মিত্র মহাশয় স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন; ৺প্রমদা দাস মিত্র মহাশয়ের পুত্র এইজন্য স্বামিজী অতীব হর্ষিত হইলেন। তাঁহার পিতার সহিত স্বামিজীর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং পরিব্রাজক অবস্থাতে স্বামিজী ও তাঁর গুরুভাইরা অনেক

সময়ে মিত্রভবনে আশ্রয় লইতেন। পূর্ব-বন্ধুর পুত্র বলিয়া তাঁহার সমধিক আনন্দ হইল।

স্বামিজীর পরিধানে একখানি বহির্বাস। ফাল্গুন মাস, এই নিমিত্ত গায়ে একটি সোয়েটার এবং চরণযুগলে গরম মোজা। স্বামিজী মেঝের উপর গালিচায় উপবেশন করিলেন। স্বামী শিবানন্দ, চারু বাবু, আমি এবং অপর সকলে সসম্ভ্রমে অদূরে বসিলাম এবং স্বামিজীর শ্রীমুখবিনিঃসৃত শব্দগুলি শ্রবণ করিতে লাগিলাম। তখন আমার বয়স উনিশ কি কুড়ি বৎসর; অভিজ্ঞতা না থাকায় সকল কথা স্মরণ রাখিতে পারি নাই। যাহা স্মরণ আছে এবং হৃদয়মাঝে যে ভাব জাগরিত হইযাছিল তাহার মর্মার্থ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

স্বামিজী ও অপর শুদ্ধ-পুরুষদিগের ইহাই একটি লক্ষণ দেখিতাম যে, আগন্তুক ব্যক্তি সন্নিকটে আসিলে কোনপ্রকার প্রশ্ন করিবার পূর্বে আগন্তুকের হৃদয়ের ভাব উল্লেখ করিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিতেন।

লণ্ডনে বক্তৃতাকালে একদিন সায়ংকালের বক্তৃতায় তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে কহিলেন, "যাহার যাহা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় লিখিয়া আপন আপন জেবের মধ্যে রাখিয়া দাও। প্রশ্নটি বলিবার কোন আবশ্যক নাই, আমি সকলেরই উত্তর বলিয়া যাইতেছি।" সকলে তদ্রূপ করিলে স্বামিজী ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, প্রশ্নটি এই। বামদিকের

একব্যক্তি উল্লসিত ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সতৃষ্ণনয়নে স্বামিজীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। পাছে লোকটি অপ্রতিভ হয় এইজন্য বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্নটি এবং সেই ব্যক্তির গৃহ, গৃহস্থিত দ্রব্যাদি, গৃহাভ্যন্তরে কে কোথায় বসিয়া আছেন, এবং সেই গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া কে কি কথা বলিতেছেন, স্বামিজী লেকচার-গৃহে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে লাগিলেন। ব্যক্তিটি আশ্চর্য ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইযা পড়িল। কি অবাককাণ্ড! কি আশ্চর্যের বিষয়! কোথায়, কোন্ পাড়ায, কোন্ গৃহের মধ্যে, কে কোথায় বসিয়া আছে, স্বামিজী তাহা স্পষ্ট দেখিতেছেন এবং সকলেরই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর বলিতেছেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছযটি বা আটটি ব্যক্তির মনোগত ভাব ও তাঁহাদের আবাসগৃহ এবং তাঁহাদের সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার সমস্তই বলিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবৃন্দেরা সকলেই ভীত, ত্রস্ত ও অতীব আশ্চর্যান্বিত হইযা উঠিল।

তাহারা সকলেই খৃষ্টান। তাহারা ভাবিল, ভারতবর্ষ হইতে এ কি এক সিদ্ধপুরুষ আসিয়াছেন! শুনিয়াছি যীশুর এরূপ শক্তি ছিল। এ আবার কি নূতন ব্যাপার চোখে দেখিতেছি! যিনি সেখানে স্বযং উপস্থিত ছিলেন তাঁহার নিকট শুনিয়া এই বিষযটি এখানে উল্লেখ করিতেছি।

সকলে একটু শান্ত হইলে স্বামিজী ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, মন উচ্চস্তরে উঠিলে মাংসপিণ্ডের

অন্তরায় মনের গতি রোধ করিতে পারে না, দূরত্ব বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না, সব এক হইয়া যায়, ইহাকে বলে,—"দূরাৎ দর্শনম্, দূরাৎ শ্রবণম্, দূরাৎ ঘ্রাণম্।" সেই সময়ে রাজযোগের বক্তৃতা হইতেছিল। রাজযোগ সাধন করিলে লোকের এইরূপ অষ্টসিদ্ধি যে আপনিই আসিয়া যায়, স্বামিজী সেইটি তাহাদিগকে বুঝাইলেন এবং বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন যে, মানুষ যেন এইরূপ অষ্টসিদ্ধিতে মুগ্ধ না হয়, তাহা হইলে উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। এই অষ্ট-সিদ্ধিকে ত্যাগ করা চাই। স্বামী সারদানন্দ তখন লণ্ডনে ছিলেন। একদিন তিনি ত্রস্ত ও ভীত হইয়া স্বামিজীর চরণযুগল ধরিয়া নানা বিষয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। স্বামিজী আজ্ঞামাত্র ইচ্ছাশক্তিতে তাঁহার দেড় বৎসরের ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার পূর্বপরিচিত নরেন আর নাই, স্বামী বিবেকানন্দ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। স্বামিজীর এইরূপ বিভূতির বিষয় বহু উল্লেখ করিতে পারা যায় এবং এখনও অনেক ব্যক্তি জীবিত আছেন যাঁহারা এই সকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

কালিদাস মিত্র চিত্র ও কলাবিদ্যা লইয়া চর্চা করিতেন এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগও ছিল। মিত্র মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে মিত্র মহাশয়ের আভ্যন্তরীণ ভাবগুলি যেন স্বামিজীর দেহকে স্পর্শ করিতে

লাগিল। তৎসঙ্গে স্বামিজীর মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও ভাবরাশি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল। স্বামিজী যেন একজন চিত্রকর, কলাবিদ্যা লইয়াই সর্বদা চর্চা করেন এইরূপ ভাবে পরিবর্তিত হইলেন। মিত্র মহাশয়ের দিকে চাহিয়া তিনি চিত্র, আলেখ্য প্রাকৃতিক চিত্রের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে লাগিলেন, বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। চিত্রকর যেন শিল্প-সভায় গিয়া চিত্রের বিষয় লেকচার দিতেছেন, এবং চিত্রই যেন তাঁহার একমাত্র জ্ঞেয় ও ধ্যেয় বস্তু এবং তিনি যেন সমস্ত জীবন-ব্যাপী চিত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

বর্ণসংযোগ, বর্ণের তারতম্য, সৌষ্ঠব, অধিষ্ঠান, নেত্রাদির বহুপ্রকার দৃষ্টি, কটিদেশ ও বক্ষঃস্থল এবং বক্রভাবে বা অন্য ভাবে দাঁড়াইলে যে নানারকম ভাবব্যঞ্জক হয় তদ্বিষয়ে তিনি বহু-প্রকার কহিতে লাগিলেন। আমরা বালক ও অল্পবুদ্ধিবশতঃ সমস্ত বিষয়টি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা যে এক চিত্রবিদ্যার আশ্চর্য বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহা আজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি।

তাহার পর তিনি ইটালি, ফ্রান্স, চীন, জাপান ও ভারতের বৌদ্ধযুগের, মোগল পারস্য প্রভৃতি নানা সময়ের ও নানা দেশের চিত্রের সমালোচনা করিতে লাগিলেন। আমরা কেবলমাত্র আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম; কিন্তু একপ গুরুতর বিষয়টির বিশেষ কোন অনুধ্যান করিতে পারিলাম না। স্বামিজী একবার ফ্রান্সের এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে নিমন্ত্রিত

হইয়া অভিনয় দর্শন করিতে যান। রঙ্গালয়ের পটগুলি বিশিষ্ট শিল্পীদ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। প্যারিস নগরীতে এই ফরাসী রঙ্গালয় ও এই চিত্রশিল্পী তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। স্বামিজী ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি অভিনয় বেশ বুঝিতেছিলেন। সহসা তাঁহার যবনিকার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়ায় তত্রস্থ আলেখ্যের কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি আছে ইহা হঠাৎ তাঁহার নেত্রে ঠেকিল। অভিনয় সমাপ্তে তিনি কার্যাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। শিল্পীও তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকায় তাঁহার নিকটে আসিলেন। কারণ স্বামিজী কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তির অভ্যাগত হইয়া অভিনয় দর্শন কবিতে গিয়াছিলেন। প্যারিস নগবীতে স্বামিজীকে বহুলোকে সম্মান করিত। এই নিমিত্ত কার্যাধ্যক্ষ এবং শিল্পী স্বয়ং আসিযা তাঁহাকে দর্শন করিলেন। যবনিকাতে অঙ্কিত আলেখ্যের যে অংশটি স্বামিজী অপরিস্ফুট বলিযা নির্দেশ করিলেন তাঁহারা তখন দেখিলেন যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে প্রকৃতই দোষ আছে এবং স্বামিজী যে প্রকার উল্লেখ করিতেছেন তাহাই সত্য। শিল্পী আশ্চর্যান্বিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন, এখন দেখিতেছি ইনি আবার চিত্রকলাতেও নিপুণ। আর একটি উদাহরণ এখানে বলিতেছি। এই ব্যাপারটি ইংলণ্ডে হইয়াছিল এবং তৎসময়ের লোক প্রমুখাৎ অবগত আছি। একদিন স্বামিজী মিস্ হেন্‌রিয়েটা মূলার ও আর দু'একজনের সহিত প্রফেসার

ভেনকে (Prof. Venn) দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মিস্ মূলার ডাক্তার ভেনের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ডাক্তার ভেন 'লজিক'-এ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁহার পুস্তকখানির নাম "Logic of Chance". এই ন্যায়শাস্ত্রে তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং ইউরোপে ন্যায়ের প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে তিনি * একজন অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যাহা হউক, স্বামিজীর সহিত ভেনের ন্যায়ের বিষয় কথাবার্তা হইতে লাগিল। ভেনের মনে ধারণা ছিল, স্বামিজী ধর্মের উপদেশ দেন, দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুর কথা বলেন; ওসব ত বাজে জিনিষ। তারপর যখন স্বামিজী ন্যায়ের কথা বলিতে লাগিলেন তখন ভেন দেখিলেন যে, এই ব্যক্তি বোধ হয় তাঁহারই মতন সমস্ত জীবন ন্যায়শাস্ত্রে অতিবাহিত করিয়াছেন; আর ভারত হইতে একজন প্রধান নৈয়ায়িক আসিয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকের সহিত দেখা করিয়া গেলেন †।

পূর্বকথিত চিত্র-প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে, চিত্র শব্দের অর্থ—চিৎ + ত্রৈ + ড। চিৎ শব্দের উত্তর ত্রৈ + ড। অর্থাৎ

---

* John Venn, Sc. D., F. R. S. (1834-1923).

Symbolic Logic এবং Inductive Logic-এর উপর ইহার অপর দুইখানি গ্রন্থ আছে। সঃ

† "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ" ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬১ দ্রষ্টব্য। সঃ

চিৎকে কি করে ত্রাণ বা অপরের সামনে বিকাশ করা যেতে পারে তাহাকে চিত্র কহে। স্বামিজী চিদাকাশে মনটি তুলিবা-মাত্রই চিত্রসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। চিত্রকলার যত প্রকার রহস্য আছে এবং যেখানে যে আলেখ্য তিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, সেই সমস্তই তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। তিনি সর্বদাই বলিতেন, "কোন একটি জিনিষ দেখিলেই সেই জিনিষটি তাঁহার sub-conscious region of the mindএ চলিযা যায়। আবার শক্তি সঞ্চার করিলেই তাহা conscious planeএ আসে।" তিনি আরও বলিতেন, "If I meditate on the brain of a Sankara, I become a Sankara ; if I meditate on the brain of a Buddha, I become a Buddha". অর্থাৎ, "আমি যখন শঙ্করের ধ্যান করি তখন শঙ্কর হইযা যাই, আবার যখন বুদ্ধের ধ্যান করি তখন বুদ্ধ হইয়া যাই। ভাবগুলির বিষয় আমি কখন চিন্তা করি নাই এবং তাহাদিগকে জানিও না। কিন্তু যখন ধ্যেয় বস্তুর সহিত একীভূত হই তখন প্রত্যক্ষ ভাবগুলি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। আমি তাহাদিগকে দেখি ও পাগলের মত কি এলো-মেলো বোকে যাই ; জানত, আমি আকাট মূর্খ বুদ্ধিহীন লোক, ইত্যাদি।" তিনি লণ্ডনের লেকচারেও এইরূপ বলিতেন ও জীবনে দেখাইতেন †।

† লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১ম ও ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য। সঃ

চিত্রের উপর স্বামিজীর এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া আমরা সকলে আনন্দিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। এ আবার কেমন ব্যক্তি? কোথায় ধর্মোপদেশ দিবেন, জপধ্যানের কথা কহিবেন, না কেবল ছবি, ছবি আর চিত্রবিদ্যা!

অপর আর এক দিন অপরাহ্নে কালিদাস মিত্র মহাশয় স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ। বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। গায়ে একটি সোয়েটার ও পায়ে এক জোড়া গরম মোজা। তিনি সম্মুখস্থ তাকিয়ায় হস্তদ্বয় রাখিয়া বক্রভাবে বসিয়া আছেন ও অতি কষ্টে নিশ্বাস লইতেছেন। আমরা সকলে অনতিদূরে গালিচার উপর বসিলাম। মিত্র মহাশয় প্রণাম করিলে স্বামিজী বলিলেন,—"শরীরটা ভগ্ন, বড় কষ্ট পাইতেছি।" মিত্র মহাশয় অসুখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"কি ব্যায়রাম তা বলতে পারি না। প্যারিসে ও আমেরিকায় অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, তাহারা রোগ নির্ণয় করতে পারেনি এবং ব্যাধিরও প্রতিকার বা উপশম করতে পারে নি।" মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, আপনি নাকি জাপান যাবেন?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "জাপান গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ওকাকুরা সেই জন্যই আসিয়াছেন। জাপানটি বেশ দেশ; তাহারা শিল্প-বিদ্যা দৈনন্দিন কার্যেতেও পরিণত করেছে। আমি আমেরিকা যাইবার কালীন জাপান দেখিয়া যাই। দেখিলাম গৃহগুলি বংশ-নির্মিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সম্মুখে একটি করিয়া বাগান আছে,

তাহাতে কিছু ফুলের গাছও আছে। ঘরগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জাতটা খুব উন্নতি করিতেছে। ঠাকুরের কৃপায় যদি আমার জাপানে যাওয়া হয়, আমি তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব। জাপানীরা পাশ্চাত্য বিদ্যা খুব অধিকার করিয়াছে। তাহারা ধর্মে বৌদ্ধ কিন্তু ধর্মের দিকে অনাস্থা; বেদান্ত ভাব কিছু তাহাদের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহাদের খুব মঙ্গল হইবে।" মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাতে ভারতের কি উপকার হইবে?" স্বামিজী বলিলেন, "উভয় জাতির মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানে উভয় জাতিরই মঙ্গল হইবে এবং তাহাতে উভয় জাতিই সমভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।"

জাপানের উন্নতির কথা কহিতে কহিতে স্বামিজীর মনে ভারতের দুঃখদৈন্যের কথা জাগরূক হইয়া উঠিল। তিনি শরীরের অসুস্থতা ও ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অতি দুঃখিত-ভাবে ও করুণস্বরে ভারতের দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। ব্যথিত হইযা মুখ বিবর্ণ হইযা গেল ও কাতর হইয়া পড়িলেন। জাপানে ভারতীয় ভাব প্রবেশ করিলে জাপানের ভিতর ধর্ম জাগিবে এই বলিতে বলিতে রামপ্রসাদী পদ মাঝে মাঝে গাহিতে লাগিলেন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। আমরা যেন রামপ্রসাদী পদেতে ভাবরাশিকে স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে লাগিলাম, এবং স্বামিজীর ভাবান্তর দেখিয়া ও ভারতের দুঃখ-কাহিনী স্মরণে আমাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। স্বামিজীর

স্বতন্ত্র মূর্তি! স্বতন্ত্র ধাম!! আমরা যেন দেখিতে লাগিলাম, "চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম।"

পরক্ষণেই আবার জাপানের উন্নতির কথা কহিতে লাগিলেন। জাপান কিরূপ সামান্য, অশিক্ষিত ও অর্ধ-বর্বর জাতি হইতে আত্মনির্ভরতার দ্বারা উন্নতিলাভ করিতেছে, সেই বিষয়ের কথাবার্তা হইতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে ফ্রান্সের বিপ্লব ও নেপোলিয়ানের কথা উঠিল। সামান্য একজন সৈনিক আত্ম-নির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় দ্বারা কি অদ্ভুত উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিলেন তাহাই তিনি কহিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে পূর্ব অবস্থার শোক, দুঃখ ও নিরুৎসাহের ভাব একেবারে তিরোহিত হইল। স্বামিজী আবার স্বতন্ত্র ব্যক্তি। স্বামিজী তখন আর ভারত-ভূমিতে নাই, দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি উল্লাসে ও তেজে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন; মুখ সুদৃঢ়, কণ্ঠস্বর গম্ভীর, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও খর তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিতেছেন। এক একবার তিনি জানুদ্বয় তাকিয়ার উপর হইতে মেঝেতে রাখিতেছেন আবার, এক একবার ঊর্ধে উল্লম্ফন করিতেছেন। নেপোলিয়ানের কথা কহিতে কহিতে তিনি স্বয়ং নেপোলিয়ান হইয়া গিয়াছেন। জেনা (Jena) বা অস্টার-লিট্জের (Austerlitz) যুদ্ধ যেন নিজে পরিচালন করিতেছেন। উন্মত্তের ন্যায় গুল্ম ও চমূবাহিনীদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন, অগ্রসর হইতে আদেশ করিতেছেন। প্রধাবন, সংঘর্ষণ, আক্রমণ করিতে গম্ভীরস্বরে উৎসাহিত করিতেছেন; শত্রুগণ বিধ্বস্ত ও

বিত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিলে তাহাদিগের প্রতি প্রধাবন ও সংঘর্ষণ কি করিয়া করিতে হয়—এইরূপ নানাপ্রকার বিভিন্ন যুদ্ধপ্রণালীতে তিনি সৈনিকদিগকে পরিচালিত করিতেছেন! আবর্তন, পরিমিত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়া, বিধ্বস্ত সৈনিকগণকে সমন্বিত করা, সাদি বা অশ্বারোহীগণকে আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করা এবং ইম্পিরিয়াল গার্ডকে (Imperial Guard) সংঘটন করিয়া নির্মমভাবে শত্রুদিগকে প্রহার করা—তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করিযা রণক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া যেন আজ্ঞা করিতেছেন, "দূরে—দূ'র—শত্রু পলাই-তেছে তথায়—! তথায অগ্রসর হও, পলায়নপথ রুদ্ধ কর। অশ্রান্ত নবচমূ, অগ্রসর হও; পূর্বগত সৈনিকদিগকে সংরক্ষণ কর", এইরূপ নানাপ্রকার মুখভঙ্গি করিয়া অঙ্গুলিনির্দেশ ও অর্ধ উল্লম্ফিত হইয়া যেন নিজে রণক্ষেত্রে সৈনিকদিগকে পরিচালিত করিতেছেন। মাঝে মাঝে ফরাসী ভাষায় রণসঙ্গীত গাহিতেছেন। সৈনিকেরা যেন উৎসাহিত হইযা পুনরুদ্দীপ্ত শক্তিতে শত্রুগণের প্রতি প্রতিধাবিত হইতেছে ও আক্রমণ করিতেছে! বন্দুক-অগ্রে সঙ্গীন সন্নিবেশিত করিতেছে; শত্রু-দিগের উরঃস্থান বিদ্ধ করিয়া বহু আয়াসে স্থানটি অধিকার করি-তেছে। সেনানীসকল ইতস্ততঃ দ্রুতগতিতে ধাবমান হইতেছে, এবং স্বামিজী মহাসেন হইয়া প্রশস্ত রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ও পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। "রণজয়ী হইল, রণ-জয়ী হইল!" এইরূপ ভাবে তিনি মহা উল্লসিত হইলেন।

কখনও বা এক হস্ত কখনও বা বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া হৃদ্‌গত ভাব প্রকাশ করিতেছেন ও মাঝে মাঝে ফরাসী ভাষায় বিজয় সঙ্গীত গাহিতেছেন।

স্বামিজী এত উত্তেজিত ও এত পরিবর্তিত হইয়াছিলেন যে, আমরা সকলে অর্থাৎ চারু বাবু, শিবানন্দ স্বামী প্রভৃতি স্তম্ভিত হইয়া উঠিলাম। ভৃত্যগণ, মালিরা এবং তৎস্থানের প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি যেখানে ছিলেন, তিনি সেই স্থানেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পদসঞ্চালনে বা হস্ত-উত্তোলনে কাহারও সামর্থ্য রহিল না। স্বামিজীর দেহ হইতে এত তেজরাশি বিকাশ হইতেছিল যে গৃহের ও তন্নিকটস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আমরা যেন গৃহ ত্যাগ করিয়া অস্টারলিট্‌জের বা জেনার রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলাম এবং নেপোলিয়ান যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করিয়া কিরূপভাবে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহাই স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম। হৃদয়ের মধ্যে অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বভাব উদ্দীপিত হইযা উঠিল। স্বামিজী স্বয়ং নেপোলিয়ান এবং আমরা যেন তাঁহার এক একজন মার্শাল নে (Ney), সূল্ট (Soult,), ভিক্টর (Victor), মারমণ্ট (Marmont), ম্যাকডোনাল্ড (Macdonald) হইয়া উঠিলাম। আমরাও যেন এক একজন নেপোলিয়ান হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে, সমস্ত বিঘ্ন অন্তরায়কে পদদলিত করিতে পারি, এইরূপ সাহস ও আত্মপ্রত্যয় আমাদের ভিতর জাগরিত হইয়া উঠিল। কি

আশ্চর্যের বিষয়! যিনি সন্ন্যাসী, যিনি সর্বস্বত্যাগী, যিনি সমাধিস্থ হইয়া থাকেন, যিনি সর্বদা ধর্মচর্চা করিয়া থাকেন, তিনি হঠাৎ কি পরিবর্তিত হইয়া মহাবিজয়ী, মহাযোদ্ধা রণপণ্ডিত ও রণকৌশলী মহাসেন হইয়া উঠিলেন। রণক্ষেত্রের গতাগতি ও কালোপযোগী চমূ-সন্নিবেশ, নানাপ্রকার ব্যূহ রচনাপ্রণালী অবলীলাক্রমে কহিতে লাগিলেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং স্পষ্টভাবে আমাদিগকে অনুভূত করাইয়া দিতে লাগিলেন।

যাঁহারা স্বামিজীকে তদবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া স্বামিজীর দেহের ভিতর নেপোলিয়ান ও অস্টারলিট্জের বা জেনার রণক্ষেত্র দেখিতে লাগিলেন। স্বামী শিবানন্দজী আমাকে বলেন, "ইহাকেই বলে, স্বামিজীর 'Inspired Lecture'*; ইউরোপ ও আমেরিকাতে স্বামিজীর সকল lectureই এইরূপ inspired অবস্থাতে হইয়াছিল।"

তৎপরে স্বামিজী "ললিত বিস্তর" গ্রন্থ হইতে বুদ্ধদেবের উক্তিটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব শিলাখণ্ডে বসিবার সময় যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, স্বামিজীও নিজের ভিতর সেই ভাবটি আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলেন:

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।

* প্রত্যাদিষ্ট বাণী।

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাম্
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।”

স্বামিজীর গুরুভ্রাতৃদিগের ও গৃহী-ভক্তদিগের প্রতি অসীম ভালবাসা ছিল। কাহার কিছু অসুখ শুনিলে বা কোনরূপ কুখবর পাইলে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তাঁহার নিজের কোন অসুখ হইয়াছে। যতক্ষণ না কোন সুখবর পাইতেন ততক্ষণ বিশেষ চঞ্চল ও অস্থির হইয়া থাকিতেন। এরূপ উদাহরণ তাঁহার জীবনে যথেষ্ট আছে এবং তাহা স্বল্পবিস্তর সকলেই জানেন।

স্বামিজীর শরীর তখন খুব অসুস্থ ছিল; মাঝে মাঝে তিনি দুঃখ করিয়া শিবানন্দ স্বামীকে বলিতেন, “ভগ্ন শরীর জোড়া-তাড়া দিযে আর ক’দিন রাখা যাবে? আর দেহটা যদিই বা যায তা হ’লে নিবেদিতা, শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) প্রভৃতি সকলেই আমার কথাটা রাখবে। এরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঠাকুরের কাজ করবে, কিছুতেই এরা বিচলিত হবে না। আমার আশা ভরসাস্থল এরাই”। এইরূপ তিনি মাঝে মাঝে আশ্বাসবাণী ও আশীর্বাদ-বাণী বলিতেন।

এই সময় তাঁহার ভালবাসা ও সকলের প্রতি আকর্ষণশক্তি এত অধিক হইয়াছিল এবং প্রাণটা এত খুলিয়া গিয়াছিল যে, যেন মনে হইত তাঁহার শরীরের প্রতি অস্থিমাংসটি একটা জমাট প্রেমের নিদর্শন দিতেছে এবং মুখ হইতে যেন প্রেমপূর্ণ স্রোতস্বতী নির্গত হইতেছে। দেখিলেই বোধ হইত—

"ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি।
সৌরভ বিতরি
আপনি শুখায়ে যায়,
মৃত্যুভয় আছে কি কুসুমে ?"

জগৎটাই যেন তিনি নিজের ভিতর দেখিতেন, আবার নিজেই জগৎ হইতেন। একবার যেন সমস্ত জীবকে নিজের ভিতর পুরিয়া লইতেছেন, তথায় রাখিয়া নিজ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া আবার বাহির করিয়া দিতেছেন। একই বহু হইতেছেন, আবার বহুই এক হইতেছেন। ভালবাসা যে এরূপ জলন্ত প্রত্যক্ষ হয়, হস্তদ্বারা স্পর্শ করা যায় তাহা জীবনে কখন দেখি নাই। কঠোরতা বা কর্কশ ভাবের লেশমাত্র নাই—"প্রেমময় মূরতি, জনচিত্তহারী*।" আবশ্যক হইলে স্বামিজী জ্ঞানমার্গের কথা বহুপরিমাণে কহিতেছেন, ভক্তির উৎস উঠাইয়া দিতেছেন, কর্মের প্রতাপে ধরণী বিদলিত বিকম্পিত করিতেছেন, ধ্যানসমাধির চরম সীমা দেখাইতেছেন আবার পরমুহূর্তে বালক, যেন কিছু জানেন না, কিছুই বুঝেন না, কখন যেন এসব ব্যাপার জীবনে শুনেন নাই।

আমরা যখন জগৎকে মাঠ, নদী, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদি পৃথক বলিয়া দেখি, তখন সমস্তই পৃথক, জড় ও মৃত বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। মহাদ্বন্দ্ব-ভাবে পরস্পরে সংঘর্ষণ করিতেছে;

---

* দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত :
„জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী"

এক অপরকে নাশ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছে—এবং "ধ্বংস—ধ্বংস"—এই বাণী সকলের মুখে বহির্গত হইতেছে। কিন্তু যখন সমস্ত বস্তুর ভিতর প্রাণ দেখি, চৈতন্যবস্তু উপলব্ধি করি, তখন ভাল মন্দ, ছোট বড়, উঁচু নীচু ভাব আর কিছু দেখা যায় না। সবই চৈতন্যময়, সবই জীবন্ত। এই চৈতন্যময় বিকাশের নাম লীলা। সবই মধুময়, সবই জীবন্ত, সবই প্রণম্য।

"চেতন যমুনা, চেতন রেণু,
গহন-কুঞ্জবন—ব্যাপিত বেণু।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
খেলা খেলা—খেলা মেলা,
নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!"

লীলা দর্শন করাই হইতেছে মহা সৌভাগ্যের বিষয়। সমস্ত সৃজিত বস্তুর ভিতর চৈতন্যস্বরূপ অন্তর্নিহিত আছেন—এইটি দর্শন করা মহা সৌভাগ্য। প্রত্যেক বস্তুই হইতেছে লীলা। সৎ অসৎ বলিয়া সেখানে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় না। লীলা দেখিলেই, লীলা উপলব্ধি করিতে পারিলেই নিত্য আপনি আসিয়া যায়। নিত্যের জন্য কোন প্রয়াস পাইতে হয় না; কারণ লীলাই নিত্য হইয়া যায়, নিত্যই লীলা।

স্বামিজী ব্যক্তিবিশেষে বা প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম প্রভৃতি নানাপ্রকার ভাব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু

প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝিতেন যে, স্বামিজীর সেইটিই একমাত্র ভাব আর ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। অপর ব্যক্তিও স্বামিজীকে আপনার ভাবের মত দেখিত এবং সেই ভাবেই তাঁহাকে বুঝিত। কিন্তু এইসকল ভাব, বিকাশমাত্র—লীলা। তিনি শ্রোতার উপযোগিতা অনুসারে তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেন, এবং যে পথ অবলম্বন করিলে তাহার অভীষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে সেইটি তিনি শ্রোতাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতেন। কিন্তু নিজে সেই ভাবের অতীত অবস্থায় থাকিতেন; তাহাকে নিত্যস্বরূপ বা নিত্য বলে। যে সকল ব্যক্তি স্বামিজীকে দর্শন করিয়াছেন তাহাদের সকলেরই মত সত্য, কিন্তু নিত্য হইতেছে সকলের উপর, তাহা পূর্ণত্ব; আর ভাবরাশি হইতেছে খণ্ডত্ব।

এই সকল কারণবশতঃ স্বামিজী অনেক সময়ে শিশু বালকের ন্যায় আচরণ করিতেন ও তদ্রূপই থাকিতেন। কোন বিষয়ে বদ্ধভাব বা উচ্চনীচ ভাব বা অভিমানের ভাব তাঁহার কিছুই থাকিত না। যখন যেখানে ইচ্ছা হয় বসিতেছেন, যা'র সহিত ইচ্ছা হইতেছে কথা কহিতেছেন; চাকর, মাঝি প্রভৃতির সহিত কাঁধে হাত দিয়া ঠিক যেন তাহাদের সমশ্রেণীর লোক হইয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন; এমন কি সামান্য সামান্য কার্যেতেও তাহাদের উপদেশ শুনিতেছেন। বালক যেমন ভৃত্যদিগের উপদেশ ও পরামর্শ লয় তিনিও তদ্রূপ করিতেন, কোন বাধা বিঘ্ন নাই। কিন্তু সকল বিষয়ের ভিতর

একটি বস্তু পরিলক্ষিত হইত,—মাধুর্য। "প্রেম, প্রেম এইমাত্র জানি", এই ভাবটি তাঁহার সামান্য কার্যেতেও প্রকাশ পাইত। বেলুড়মঠে মৃত্তিকা দিয়া সমতল করিবার সময় যে সকল ধাঙ্গড় আসিয়াছিল, তাহারাও মুগ্ধ হইয়া স্বামিজীর কাছে বসিয়া থাকিত আর বলিত, "হারে, তোর কাছে গিলে হামরা সব কাজ ভুলে যাই, তোর মিঠে বুলি শুনলে হামরা কাজ করতে পারি না, তাহ'লে ঐ বুড়োটা (জনৈকের প্রতি নির্দেশ করিয়া) হামাদের রোজ দিবে না।"

আমরাও যখন অল্প বয়সে স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাই, তখন জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান, কর্ম এসব বিষয় কিছুই বুঝিতাম না; বালক বালকের স্বভাব। কিন্তু স্বামিজীর ভালবাসা স্বতন্ত্র জিনিষ ছিল, তাহা মানুষের ভালবাসা নয়—অন্য জগতের ভালবাসা; তার কাছে অন্য ভালবাসা ফিকে হ'য়ে যায়। সেই ভালবাসার জন্যই আমরা তাঁহার কাছে যাইতাম। স্বামিজীকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে, জীবনে এমন একটা লোক দেখিয়াছি যিনি ভালবাসিতে জানেন, এবং যিনি শুধু ভালবাসাই শিখাইতে এ জগতে আসিয়াছিলেন। এই ভালবাসার জন্য কত যুবক গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেছে, একটি ধাঙ্গড়কে বাঁচাইতে যাইয়া নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিতেছে, দেশে দেশে ঠাকুর স্বামিজীর কথা প্রচার করিতেছে। প্রেমই সাধনা, প্রেমই তপস্যা, প্রেমই ভগবান।

ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা, সমস্ত দেবতাদিগের নিকট

এই প্রার্থনা, সমস্ত ঋষিদিগের নিকট এই প্রার্থনা, সমস্ত সিদ্ধপুরুষদিগের নিকট এই প্রার্থনা, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবের নিকট এই প্রার্থনা যে, যেন এই স্বামিজী-চরিত ধ্যানীর ধ্যানমার্গের সহায়তা করে, যোগীর যোগের সহাযতা করে, ভক্তের ভক্তির সহায়তা করে, জ্ঞানীর জ্ঞানের সহায়তা করে, কর্মীর কর্মের সহায়তা করে এবং সাধারণ লোকদিগের অদ্ভুত আদর্শ দর্শন করাইয়া সকলকে স্বামিজীর দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। ভারতের প্রত্যেকের ভিতর, জগতের প্রত্যেকের ভিতর যেন দেবভাব জাগ্রত করিয়া দেয়। যেন সকলের ভিতর সেই মহান আদর্শ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। আচণ্ডাল সকলের চরণে আমার বিনীত প্রণাম, তাঁহারা পবিত্রমনে আশীর্বাদ করুন, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হউক। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

সমাপ্ত।
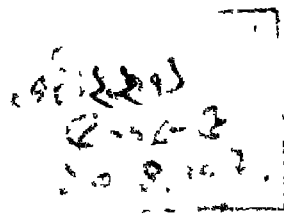
কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

পরিশিষ্ট

পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ মহারাজ) হইতেছেন এই গ্রন্থের 'আমি'। পূর্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল, হরিনাথ ওদেদার। কি অপূর্ব যোগাযোগ হওয়ায় এই ক্ষুদ্রকায় প্রামাণ্য-গ্রন্থখানির রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল, পূজনীয় লেখক মহাশয় তাঁহার প্রাগ্‌বাণীতে উহা সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির জন্য লেখক মহাশয় এবং স্বামী সদাশিবানন্দের প্রতি সভ্যজগৎ চিরতরে কৃতজ্ঞ থাকিবে। এই গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রচারিত হইলে সমগ্র মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

গ্রন্থের এই বর্তমান সংস্করণটিকে দ্বিতীয় সংস্করণ না বলিয়া প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ বলা যাইতে পারে, প্রথম সংস্করণে কোথাও পাদটীকা ছিল না, বর্তমান সংস্করণে স্থানে স্থানে পাদটীকা দেওয়া হইয়াছে। ইহার ভালমন্দ অবশ্য পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

কাশীধামের তথা উত্তর-ভারতের প্রসিদ্ধ সাধু শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া উঠে নাই (পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য); কারণ ভাস্করানন্দজীর দেহত্যাগ হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, আর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বায়ুপরিবর্তনের কথাবার্তা উঠিলেও স্বামী বিবেকানন্দের তখন কাশী যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ কাশীধামে যান ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে

(১৯০২ খৃঃ, ফাল্গুন মাস—পৃঃ ৫৯ ও ৬৮ দ্রষ্টব্য)। তিনি তথায় প্রায় তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়াছিলেন [এ সম্বন্ধে স্বামী সদাশিবানন্দের সহকর্মী (পৃঃ ৪, ৫ দ্রষ্টব্য) পরলোকগত স্বামী শুভানন্দের জীবনী, "Seva" নামক ইংরাজী গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের ভূমিকাসহ (শিবালা, কাশী, ভাদ্র ৩০, ১৩৩৭) কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে উক্ত জীবনী বাংলায় প্রকাশিত হইলে, উহা পরে ইংরাজীতে অনূদিত ও প্রচারিত হয়]।

অন্যত্র (The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, Vol IV , অধুনা উহা সংক্ষিপ্তাকারে এক খণ্ডে প্রকাশিত) যাহা 'গোপাললাল ভিলা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে উহা 'সৌধাবাস' নামে উল্লিখিত হইয়াছে (পৃঃ ৮ দ্রষ্টব্য); কারণ তদানীন্তনকালে কাশীর জনসাধারণের নিকট ঐ বাটী 'সৌধাবাস' নামেই অধিকতর পরিচিত ছিল।

গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী হইতে উদ্ধৃত পদ ও বাক্যগুলি লেখক মহাশয়ের "গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প" নামক পুস্তকে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত) বিশেষভাবে এবং তাঁহার রচিত দুইখানি "অনুধ্যানে" সামান্যভাবে আলোচিত হইয়াছে, সেইজন্য এই গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে পাদটীকা বা কোনও নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। ইহা ব্যতীত মাইকেল ও স্বামিজীর গ্রন্থসমূহ হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলির সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। আশা করি ইহাতে পাঠকগণ কোনও অসুবিধা বোধ করিবেন না।

কবির বাণী অবিকল উদ্ধৃত হইলে এই গ্রন্থের ভাব কিঞ্চিৎ বিপর্যস্ত হইতে পারে—এই জন্য "রোমিও জুলিয়েট"-এর বাক্যগুলি সামান্য পরিবর্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছিল (প্রথম সংস্করণের ১৪, ১৫ পৃষ্ঠা

দ্রষ্টব্য); বর্তমান সংস্করণেও তাহাই করা হইয়াছে (৬, ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এইস্থানে উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক যে, নিম্নলিখিত বাণীগুলি গ্রন্থকারের নিজ রচনাবলী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে যথা:

(১) লক্ষ্যহীন ভ্রমি ধরামাঝে······(পৃ: ৪৪)

(২) **A great man is one who can**······(পৃ: ৪৮)

(৩) **A great man is the outcome of revolution...**
(পৃ: ৪৯)

সমাজদর্শনের দিক দিয়া এই গ্রন্থের ৫১-৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত, যুগপ্রবর্তক আজ্ঞাপ্রদ ভাবগুলি যাঁহারা তুলনামূলক আলোচনা ও তর্কযুক্তির দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় ও গ্রন্থ-গুলি আমরা উল্লেখ করিতেছি—

(ক) লেখক মহাশয়ের গ্রন্থাবলী:

(১) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান (পৃ: ১৬০-৬৪)।

(২) শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান।

(৩) **Lectures on Education.** ইহা উত্তমরূপে পঠিতব্য। বিশেষ দ্রষ্টব্য পৃ: ৭৮।

(৪) **Homocentric Civilization.**

(খ) ধর্ম বা নীতিশাস্ত্রের (**Ethics**) উপর ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা সম্বন্ধে লোকমান্য তিলকের গীতা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদ) দ্রষ্টব্য।

(গ) বিচারপতি ডা: শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "টেগোর 'ল'" লেকচার-এ ইষ্ট ও পূর্ত লইয়া আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(ঘ) **G. J. Holyoake**-এর পূর্বে এবং পরেও **secularism**-এর (ঐহিকবাদ) উপর বহু গ্রন্থ ও নিবন্ধাদি রচিত হইয়াছে। **Humanism** (মানবত্ববাদ), **State, Civilization** প্রভৃতি বিষয়সমূহ লইয়া

আলোচনা বহুলভাবে হইয়াছে এবং হইতেছে। দিগ্‌দর্শনের সুবিধার জন্য পাঠক ও সাধ্যায়গণ Dr. Seligman-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত Encyclopaedia of Social Sciences, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের সংকলনটি দেখিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

এই গ্রন্থে এবং তাঁহার Lectures on Education প্রভৃতি সমাজ-বিষয়ক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত যুগপ্রবর্তক ভাবকে বিশেষিত করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় 'homocentric' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। Secular (ঐহিক) এই বিশেষণ তিনি কেন ব্যবহার করেন নাই তাহা উপরের গ্রন্থ ও বিষয়সমূহ হইতে প্রতিপন্ন হইবে। Secularism হইল আশ্রয়প্রার্থী ভাব—উহা খণ্ড ও অল্পপরিধিযুক্ত। বর্তমানকালে আমাদের নিজস্ব ভাব,—সভ্যতা, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্র হইল মানবকেন্দ্রিক (Homocentric)। এই ভাব ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিবে।

এক্ষণে বলা আবশ্যক যে, এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে যে সকল মুদ্রণ-জনিত ভ্রম-প্রমাদ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, উহা সাধ্যমত সংশোধিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও যদি কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া গিয়া থাকে, আশাকরি সুধী পাঠকবৃন্দ তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আমাদের একটি ত্রুটি এইখানে সারিয়া লইতে চাই যথা, পৃঃ ৫, লাইন ৮, 'হরিদাস' স্থলে 'হরিনাথ' হইবে।

পরিশেষে ব্যক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থখানি স্বামিজীর জীবনচরিতের উত্তরপর্বের শেষ অধ্যায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ কাশীধাম হইতে বেলুড়মঠে ফিরিবার পর স্বামিজী মাত্র চারি মাস কাল জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থে যে সুগন্ধি ও দীপ্তিমান্ ভাব বিকীরিত হইয়াছে, আশা করি তাহা আপামর সাধারণকে স্থায়ী ও শাশ্বত আনন্দ দান করিবে। ইতি—

(১লা আষাঢ়, ১৩৬০) শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের রচিত
গ্রন্থাবলীর তালিকা।

* চিহ্নিত গ্রন্থগুলি বর্তমানে পাওয়া যায় না।

Religion, Philosophy, Psychology etc.

		Rs.	As.	P.
	1. Natural Religion	1	0	0
	2. Energy	1	0	0
	3. Mind	1	0	0
*	4. Metaphysics			
	5. Reflections on Woman	1	4	0

Art and Architecture

		Rs.	As.	P.
*	1. Dissertation on Painting			
	2. Principles of Architecture	2	8	0

Literary Criticism and Epic

		Rs.	As.	P.
*	1. Appreciation of Michæl Dutt and Dinabandhu			
*	2. Kurukshetra			

Social Science

		Rs.	As.	P.
	1. Lectures on Status of Toilers	2	0	0
	2. Homocentric Civilization	1	8	0
*	3. Status of Women (with Bengali translation)			
	4. Lectures on Education	1	4	0

	Federated Asia	4	8	0
6.	National Wealth	5	8	0
7.	Nation (in the press)			
8.	New Asia (in the press)			
9.	Nari-Adhikar (Hindi) (Translation of 'Status of Women')	0	12	0

অনুধ্যান, দর্শন প্রভৃতি

		মূল্য		
		টা.	আ.	পা.
* ১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান			
* ২।	অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১	8	০
৩।	মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১	8	০
৪।	শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী	৩	০	০
৫।	শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান	০	৮	০
* ৬।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড)			
৭।	ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড)	১	৮	০
* ৮।	শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (তিন খণ্ড)			
৯।	সাধুচতুষ্টয়	০	১২	০

১০।	ব্রজধাম দর্শন	১	৮	০
১১।	বদরীনারায়ণের পথে	২	৪	০
১২।	নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন)	১	০	০
১৩।	মায়াবতীর পথে (যন্ত্রস্থ)			

কাব্য, সমালোচনা প্রভৃতি

* ১।	বৃহন্নলা			
* ২।	ঊষা ও অনিরুদ্ধ			
৩।	পাশুপত অস্ত্রলাভ	৫	০	০
৪।	গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)	১	৮	০
৫।	খেলাধূলা ও পল্লীসংস্কার	০	২	০
৬।	” (নেপালী অনুবাদ)	০	১	৬

লেখক মহাশয়ের জীবনীর কিঞ্চিৎ বিবরণ :

ব্রহ্মচারি-শ্রীপ্রাণেশকুমারের রচিত 'মহিমবাবু' ২ ০ ০

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের রচিত একটি নূতন গ্রন্থ :

Dialectics of Land Economics of India 6/8/-